দাম—একটাকা বারআনা

প্রকাশক

অমল বসু

ঈগল পাবলিশার্স

১০৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট

প্রিণ্টার :

শ্রীফণীভূষণ হাজরা

গুপ্তপ্রেশ,

৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু কে

"The play of one's mind gave one away, at the last, dreadfully in action in the need for action, where simplicity was all......

Henry James

Thus when two diverse individuals function as one organism, *all that they encounter* acquires a new significance. It is not merely addition of the experience of one to that of the other, making the combined view a larger whole seen, but that with new polarity a new *quality* is given to their apprehension. And the quality of perception is given not only to what is experienced at the moment but that experience itself influences what they in their new functional orientation will in the future experience, hence altering their every action.

Pearse and Crocker The Peckham Experiment.

We are really only just beginning to regard the relationship of a human individual to another individual dispassionately and objectively, and our attempts to such a relationship have no pattern before them. And yet in the passage of time, there are now several things that are ready to help our shy novitiate.

Rainer Maria Rilke

এলিঅট্ আমাদের এতো নাড়া দেন এবং সেই বেদনার আবেগেই তাঁর চিত্রকল্পগুলি প্রতীক হয়ে' ওঠে। এলিঅটের প্রতিনিধি-মূল্যও এই কারণে এতো বেশি। এ যন্ত্রণার উৎস শেষ পর্যন্ত স্বভাবের গভীরে এক দ্বন্দ্বে, নানা অভিজ্ঞতার সমষ্টিতে নয়,—খাপছাড়া অনুষঙ্গে। এলিঅটের স্বকীয় প্রতিভার রসায়নে আমাদের সমাজের এই বিচ্ছিন্নতা কাব্যরূপ পেয়েছে। তাই একালের কবিদের তাঁর কাছে ঋণস্বীকার করতে হয় বারবার। খণ্ডচৈতন্যের এমন একাগ্র উপলব্ধি ও এমন কাব্যসমৃদ্ধ রূপ এবং তার থেকে বর্ধমান নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কাব্যজগতে এলিঅটের দান। এ দান ভুললে এলিঅটোত্তর কাব্যের মুক্তির উৎসও ভুলতে হয়।

অখণ্ড চৈতন্যের অভাবের জন্য এলিঅটের দায়িত্ব অনেকখানি নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাইরে। আত্মসচেতন মানস স্বকীয় দ্বিধায় খণ্ডিত সমাজে দীর্ণ হতে বাধ্য, সততা যদি থাকে। এখানে এ দ্বিধাব ইতিহাস বা কারণ নির্দেশ অবান্তর। এলিঅটের শেষ বয়সের কাব্যে চৈতন্যের সন্ততি বা বিস্তার ও একতার ভাববিলাসী প্রশ্ন উঠে' কি ভাবে কাব্যকে রঙিয়েছে, তাই সংক্ষেপে দেখা যাক্।

প্রশ্নটির চঞ্চলতা, সুদূরের পিয়াসী আমাদের এই শেষ রোমান্টিককে প্রেরণা দিয়েছে ক্লাসিসিস্‌মের দিকে; হৃদয়বেদনা তাই খুঁজেছে গির্জার সমর্থন: সমাজ-বোধের অভাব আত্মগোপন করতে গেছে সামন্তবাদী রাজশক্তির কল্পনায়। লক্ষণগুলি নগণ্য নয়, কারণ এলিঅট শুধু আত্মসচেতন কবি নন, যদিচ সে কীর্তিও নির্বোধ আনাড়ী কাব্যতত্ত্বের প্রচলনের জগতে প্রচণ্ড সিদ্ধি। তার চেয়ে বড়ো কথা, এলিঅট্ হচ্ছেন আত্মসচেতনতারই মহাকবি। তাঁর কাব্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে আত্মসচেতন মানস, তার নাট্যরূপ ভিন্ন কবিতায় ভিন্ন হলেও। ইংরেজি কাব্যে তার প্রয়াস এই প্রথম,—ভালেরি ও রিল্‌কে-র কথা দুটো কারণে এখানে ওঠে না। প্রথমত তাঁরা বিদেশী; দ্বিতীয়ত, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভালেরি বা রিল্‌কে-র মধ্যে যন্ত্রণা এতো তীব্রতায় দানা বাঁধে নি

বলে'ই হয়তো তাঁদের আত্মপ্রকাশ কবিত্বে প্রচ্ছন্ন। আত্মসচেতনতার সাহিত্যরূপ অবশ্য গদ্যে দেখা গেছে প্রুস্তে, জয়সে, কাফ্‌কায়, খানিকটা ভর্জিনিয়া উল্‌ফে। ইংরেজি কাব্যে কিন্তু এলিঅট্ অতুলনীয়; তাঁর এই আপন সত্তার মুখোমুখি কাব্যযাত্রার অমাবস্যাই আমাদের মন বিচলিত করে। শিল্প-সাহিত্যের মানসে সামাজিক কারণে বা যে কারণে হোক পূর্বোক্ত দ্বন্দ্ব অর্থহীন, যদি না এই চৈতন্যের আত্মনির্ভরতা দেখা দেয়। শিল্প-সাহিত্যের বিষয়ী মনের পক্ষে দ্বন্দ্বের নিরাকরণে প্রয়োজন ঐ প্রাগাত্মচৈতন্য, অর্থনীতির মূল্যবান ছক্ নয়।

চৈতন্যের সন্ততি ও একতার প্রশ্নেই জড়িত কর্মজীবন, মানসিক সক্রিয়তার তাগিদ্। এলিঅটের আত্মসচেতন ভারসাম্য পাবার বারম্বার চেষ্টাই আমার কথার প্রমাণ। ১৯১৭ সালেই এলিঅট্ বোঝেন আত্মসচেতনতার প্রকৃতি—তাঁর ভাষায়, প্যর্সনল্যাটি বা ব্যক্তিস্বরূপ এবং নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ। কারণ ব্যক্তিবাদের যুগে নৈর্ব্যক্তিকতার জান্‌লার পথেই ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি। অতঃপর অল্প বয়সেই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ—ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা। পশ্চিম য়ুরোপের ঐতিহ্য এলিঅট্ নিজে সংগ্রহ করছিলেন প্রচুর ও গভীর। দুর্ভাগ্যক্রমে তন্ময় পশ্চিম য়ুরোপে এসে পড়ল গত মহাযুদ্ধ আর গত শান্তিপর্ব। নৈরাশ্যের পোড়োমাঠে এলিঅট্ দেখলেন নৈর্ব্যক্তিকতার আরো গভীরে শিকড়ের প্রয়োজন, এবং ভাবলেন তাঁর ঐতিহ্যবোধ তার সহায় হবে ভাব-দুর্গের মধ্যেই মৃত্তিকা সন্ধানে। এ সন্ধানের পরিণাম যে ধর্মধ্বজ হবে তাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে এই মনোভাব যে-হিসাবে এবং যতোখানি তাঁর কবিতার উপজীব্য জুগিয়েছে, সে-হিসাবে তা মোটেই নৈর্ব্যক্তিক নয়, ধ্রুপদীও নয়। নৈর্ব্যক্তিকতা বা ধ্রুপদী শান্তির নির্ভর সমাজ-ব্যাপী পুরাণে, যে পুরাণ মোটা একটা সমাজ-সংস্কৃতির একতায় ব্যক্তিসাধারণকে আশ্রয় দেয়। পুরাণ যে ঐতিহ্য-জ্ঞানার্জনে তৈরী করা যায় না বা পুরাণ যে কখনো ব্যক্তিগত সৃষ্টি হয় না, এ ভুল প্রাচীন রোমান্টিক কবিরা পণ্য-বিপ্লবের

পরে তাঁদের উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের মর্যাদার অন্বেষণে করলেও, এলিঅট্ নিশ্চয় তা করেন নি। অন্তত এলিঅটের পক্ষে তা করা মানায় না, শেলি বা ব্লেকের উপরে অতো কঠিন সমালোচনার পরে।

পুরাণের পটভূমির খোঁজে কালোপযোগী সামাজিক পরিবর্তনে ভীরুর গন্তব্য হয়ে' পড়ে ফ্যাশিস্‌মের স্নায়ুবিকারে জোরকরে'-তৈরী সাময়িক একতার ছক্। পাউণ্ডের মতো এলিঅট্ তাতে ঝোঁকেন নি। তাঁর বিবেচনায় ইংরেজি গির্জার আশ্রয়ে ক্যাথলিক ঐতিহ্যের নিরাপদ দিব্যভাবের আবেদন বেশি। ব্লেক সম্বন্ধে এলিঅটের মন্তব্য ছিল: পুরাণাভাবে বাধ্য হয়ে এই সব কল্পনায় যদি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টিব প্রতি,—সাধারণ বুদ্ধির উপবে, বিজ্ঞানেব নৈর্ব্যক্তিকতার উপরে,—শ্রদ্ধা থাকত, তাহ্‌লে ব্লেকের উপকারই হত। মন্তব্যটি এলিঅটের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

এলিঅটের যে ঐ ব্যক্তিনিরপেক্ষ শান্ত দৃষ্টির উপবে লোভ অছে, সেটা স্পষ্ট। কিন্তু বিজ্ঞানে তিনি নিরুৎসাহ; বিজ্ঞান মানুষের মূল্য স্বীকারে আজ তৎপর বলে'ই কি? তিনি ফিরে চান ধর্মের মাল-মশলার ফর্দ; তাঁর যাদুঘর ঐতিহ্যের সামাজিক প্রাণ একদা ছিল বলে'ই সেই বিগত যুগের টুকিটাকিতে তিনি অশ্রুপাত করেন। ব্লেক্ এবং শেলির বেলাতে যেমন, এলিঅটের ক্ষেত্রেও 'চিন্তা, আবেগ ও দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা' শুধু কবির দায়িত্ব নয়, সেটা জড়িত 'কবির পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যেখানে কবির প্রয়োজন মেটেনি'। কবি হিসাবে এলিঅট্‌ও হয়তো 'এইসব কারণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন'।

আমাদেরই মতো এলিঅট্ মানুষের ইতিহাসটা দেখতে গিয়ে থম্‌কে গেছেন ক্যাপিট্যালিস্‌মের ব্যাপারটায়—তাঁর মতে যা অর্থনীতি ও যন্ত্রশিল্পে একটা খট্‌কা মাত্র। সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো এই খট্‌কার ব্যাপারটার ফল হয়েছে জন্ ডিউঈ-র ভাষায়:

compartmentalisation of occupations and interests which brings about separation of that mode of activity

commonly called "practise" from insight, of imagination from executive doing, of significant purpose from work, of emotion from thought and doing...Those who write the anatomy of experience then suppose that these divisions inhere in the very constitution of human nature.

তাই গীডিয়ন্ বলেছেন ভালো, যে গত শতাব্দীর দায়ভাগে মানুষের বিবিধ কর্মধারাও স্বতন্ত্র, প্রতিযোগী হয়ে' উঠেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের laissez-faire and laissez-aller মানসিক জীবনের কচঙ্গনে প্রয়োজিত।

মানুষের চৈতন্যের এই খণ্ডতায় এলিঅটের যন্ত্রনা ডিউঈ-ভাষ্যের অনুবর্তী। তিনি একে মানবস্বভাবের চিরাচবিত পাপপুণ্যেব জালে ফেলে ঈশ্বরের অখণ্ডতার দুরূহ সন্ধানে ব্যস্ত। অর্থনীতি ও যন্ত্রগুলোর ঐ সামান্য ব্যাপারটা সংশোধনের অনেক বেশি সহজসাধ্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে'' তাই এলিঅট্ অসম্বন্ধ মুহূর্তে শান্তি খোঁজেন, ফাঁকি দেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বরূপের মতবাদে। সে ব্যর্থ চেষ্টায় যন্ত্রণা .বৃদ্ধিই পায (যন্ত্রণা বৃদ্ধিতে অবশ্য কাব্যের আবেগ আরো তীব্র হয়ে ওঠে)।

সুবিধা হচ্ছে এ ফাঁকিতে ফাঁপামানুষ ঠাসামানুষের কিছু দায়িত্ব থাকে না, কারণ মানুষের মন তো বহুধা হবেই। বহুকাল আগে তাঁর ঐতিহ্য-প্রবন্ধে (আমার বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তর স্বগত দ্রষ্টব্য) এলিঅট্ লেখেন :

The point of view which I am struggling to attack is perhaps related to the metaphysical theory of the substantial unity of the soul ; for my meaning is, that the poet has, not a personality to express, but a particular medium, which is only a medium and not a personality.

মীডিয়ম্ বা শিল্পপদ্ধতি-কে যে কি করে' শিল্পী প্রকাশ দেবে সে প্রশ্ন না তুলে বলা যায় যে শিল্পী, প্রকাশ নয়, ব্যবহার করে তার শিল্পপদ্ধতি,—মানস ও শিল্পবস্তুর জ্যাবদ্ধ সহযোগিতার ও বাধার মধ্যে দিয়ে। মনের একতা সমগ্রতা-কে

এলিঅট্ একাকার সংমিশ্রণ বলে ভুল করেন, সে প্রশ্নও এখানে তোলা নিষ্প্রয়োজন।

শুধু স্মরণীয় যে এই রোমাঞ্চসাধনা এলিঅটের ভাষা-ব্যবহারের মাত্রাতেও দ্রষ্টব্য। জন্‌সনের পদাঙ্কে তিনি ন্যায়তই ধমক দিয়েছিলেন মিলটনের অপ্রাকৃত ভাষা-ব্যবহারকে। তিনি নিজে অবশ্য ভাষার ধর্ম বা প্রকৃতি অনুসারে শব্দ বাক্য ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। মিল্টনের মতো অমিত্রাক্ষরের চৈনিক প্রাচীর তৈরি করার গুরুচণ্ডালী দোষ না থাকলেও কিন্তু কাল্ ফস্‌লের-এর অর্থে এলিঅটের ভাষাব্যবহারও খানিকটা অপ্রাকৃত। ধরা যাক্ ঈষ্ট কোকর্-এ সেই জাঁকালো ছত্র যেখানে এলিঅট্ সেকেলে ইংরেজিতে পূর্বপুরুষের কথা বলেন কিন্তু উহ্য থাকে সমরসেটশিয়রের গণ্ডগ্রামের বর্ণনা। সপ্তদশশতকে নাকি এলিঅটেরা ঐ গ্রাম ছেড়ে সাগরপারে যান। কিম্বা আগেকার কোনো একটি কবিতা ধরা যাক্—বর্ব্যাঙ্ক উইথ্-এ বাযডেকের দেড় পৃষ্ঠাব কবিতাটি ঐতিহ্যের ভাঁড়ার বল্লেই হয়। সেক্‌স্‌পিয়রের নানা রচনা থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখের সংখ্যা অন্তত নয় হবে, তাছাড়া গতিযে, সেণ্ট্-অগষ্টীন্, হেন্‌রি জেম্‌স্, ব্রাউনিং, রসকিন্, ডন্, মার্সটন, ফোর্ড ও স্পেন্সর আছেন।

পেটার সম্বন্ধে এলিঅট্ লিখেছিলেন, "...it represents, and Pater represents more positively that Coleridge of whom he wrote the words, 'that inexhaustible discontent, languor, and homesickness...the chords of which ring all through our modern literature.' সিম্বলিষ্টদের গুরু-স্থানীয পেটারই প্রথম চর্চা করেন মুহূর্তমাহাত্ম্যের, হীরকদীপ্তিতে মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বলা-র তীব্রতার: to give nothing but the highest quality to your moments as they pass, and simply for those moments' sake.

মুহূর্তের ক্ষণিকতাই যন্ত্রণার কারণ, মুহূর্তের এই নশ্বরতাই মহৎকাব্যের বিষয় এলিঅটের শেষ চারটি কবিতায:

The moments of happiness—
Not the sense of wellbeing, fruition, fulfilment, security or affection,
Or even a very good dinner, but the sudden illumination—
We had the experience but missed the meaning,
And approach to the meaning restores the experience
In a different form, beyond any meaning
We can assign to happiness.

অথবা—

For most of us, there is only the unattended
Moment, the moment in and out of time,
The distraction of it, lost in a shaft of sunlight,
The wild theme unseen, or the winter lightning,
Or the waterfall or music heard so deeply
That it is not heard at all, but you are the music
While the music lasts.

এই সব সুখের মুহূর্তগুলি—পাতার আড়ালে শিশুর দল, হাস্যরত, সূর্যের রশ্মিপাতে হঠাৎ উচ্ছল বা নিরুদ্দেশ; শুষ্ক সরোবরের শানে রৌদ্রের ছটা; গোলাপ-বাগানের কুঞ্জগলি; ত্বরিতে, এখনই এখানে, এখনই, চিরকাল—এই সব মুহূর্তগুলি বারবার ঘুরে' ফিরে' আসে চারটি কবিতাতেই এবং পরিবারের পুনর্মিলন নামক নাটকে। এই মুহূর্তগুলিই কি the spring of the turning world?

ঘূর্ণায়মান বিশ্বের স্থিরকেন্দ্রে দোলকযন্ত্রের প্রতীকটি এলিঅটের কাব্যে কোরিওলান্ যাবৎ দ্রষ্টব্য। প্রতীকটি তাঁর বহু গভীর কাব্যাংশের কেন্দ্র। মনে হয় এই পরিবর্তমান বিশ্বের স্থিরবিন্দুটি, there where the dance is, যে নাচে বিশ্বজন মোহিছে, নাচের গতিতে নেই, যতোটা আছে ঐ সব নিছক মুহূর্তে, আছে শৈশবের অমর স্মৃতিতে। অর্বাচীন রোমাণ্টিক্ ওঅর্ডসওঅর্থের মতো, প্রবীণ ধ্রুপদী এলিঅটও গান করেন শিশুমনের নিরালম্ব শুদ্ধতার।

Issues from the hand of God, the simple soul (Animula).
ঈশ্বরের হাত থেকে বাহিরিয়া সরল হৃদয় যদি বিজ্ঞানে চেষ্টা না করে "পরিবর্তমান সদা আকারে ও বর্ণে চির জড় এ পৃথিবী" নিয়ন্ত্রিত করতে, তাহলে পেটারের মুহূর্তসাধনা ছাড়া উপায় কি বা ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের শৈশবের অমরতাবাহক সংবাদ ছাড়া? কারণ শিশু স্বভাবতই আত্মসচেতনতায় বিধুব নয়। কিন্তু ঐ নাচের প্রতীক?

প্রত্যক্ষ জীবনের অবসাদ ও বুদ্ধিগত পরোক্ষতত্ত্বের প্রাণবত্তায় চিন্তিত ভালেরি এই নাচের প্রতীক টেনেছেন তাঁর স্থপতি য়ুপালিনস্—মন ও নৃত্যের বিষয়ে নামক সক্রাটিক্ আলাপে। ভালেরির যুক্তি এলিঅটের চেয়ে বেশি সম্পূর্ণ, সাধ ও সিদ্ধান্ত-সঙ্গত। দীর্ঘ এক আলোচনায় চিকিৎসার বাইরে এই জীবনাবসাদরোগ ক্ষণিক আরাম পেল শিল্পের স্বাধীন সত্তার স্পর্শে, আতিক্তের নাচের পরোক্ষ মুক্তিতে; এবং সক্রাটিস্ বলে ওঠেন:

হে অগ্নিশিখা!...
মেয়েটি আসলে হয়তো মস্তিষ্কহীন?...
হে অগ্নিশিখা!..
কে জানে ওর অতিসাধারণ মনটা কতো কুসংস্কারে
আর কতো খামখেয়ালে বোঝাই?..
হে অগ্নিশিখা, চির নিবাতনিষ্কম্প্র! প্রাণময় আর দেবতুল্য!.
এই অগ্নিশিখা, এ আর কি, বন্ধুগণ! যদি না এ হয় সাক্ষাৎ মুহূর্তটিই?...

এলিঅট্ কিন্তু ঐ অবসাদ-সীমা ছাড়িয়ে নাচটাকে একেবারে এবস্ট্রাক্‌শন বা পরোক্ষতত্ত্ব ভাবে দেখেন না, নর্তককেও দেখেন না। অথচ নৃত্যের বিষয়ানুগ নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর মতো মহাকবিকে কাব্যবিষয় জোগাতে পারত। চিত্রকল্পটা সরল ও দ্বৈত—এক হচ্ছে দর্শক দূর থেকে বসে দেখে এবং নর্তকদের খণ্ডগতির সমষ্টিতে উপলব্ধ হয় নাচটার রূপ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কবি নৃত্যের

মধ্যে সক্রিয়, নৃত্যের কেন্দ্র ঘিরে ঘুরে ঘুরে এদিকে ওদিকে সংলগ্ন নর্তকরা যেখানে নৃত্যকে মূর্তি দিচ্ছে। নৃত্যের খণ্ডিত কিন্তু সক্রিয় উপলব্ধিতে আসে নৃত্যের পরোক্ষ রূপটি, স্থানে কালে সমগ্রে ও খণ্ডের সংলগ্নতায়। এখানে দর্শকের ব্যক্তিগত বিষয়ী চিন্তাবলীতে উপলব্ধির আরম্ভ নয়। অংশের ক্রমিকতায় নয়, নর্তকের স্বাতন্ত্র্যে নয়, সারা নৃত্যে সক্রিয় উপলব্ধি একাগ্র। আমার প্রতীকটা স্থূল হল, কিন্তু এলিঅটের লেখনীতে এ প্রতীকের কাব্যোৎসারে বিশ্ব ও ব্যক্তি, বিষয় ও বিষয়ীর চৈতন্যকৈবল্য কি মর্মস্পর্শী রূপ নিতে পারে তা কল্পনীয়।

শেষ কবিতাগুলিতে এলিঅট্ এ প্রতীকের খুবই কাছাকাছি আসেন। তাঁর অন্বিষ্ট—বিষয়সর্বস্ব বা বিষয়বিষয়ীর দ্বন্দ্বাতীত স্থিরবিন্দুটি, স্থিতি যার গতির মধ্যে, অবিচ্ছিন্ন চিৎপদ্মের মধ্যমণিতে। বিষয়লগ্ন এই দৃষ্টি সম্ভব সক্রিয়চক্রের মধ্যে অস্তিত্বস্বীকারেই, উপর থেকে আবছা দেখায় বা পাশ থেকে তির্যক দৃষ্টির ছবিতে দ্রষ্টাদৃশ্যের মীমাংসা ঘটে না। এবং এই চক্রবৎ পরিবর্তন তো জীবনেরই গতি যার পরিধির পারে শুধু মৃত্যুরই নেতি নেতি। তাই মৃত্যুর জীবন্ত ছলা—মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দর্শকের স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু এ স্বাধীনতায় নৃত্যের রূপায়ন ব্যাহতই হয়, স্থিরবিন্দুটি হয় অস্থির। ঘূর্ণায়মান বিশ্বের স্থির-বিন্দুর এ প্রতিবাদে, মানছি, অশান্ত হৃদয় অনেক চমৎকার কল্পনা ছিটিয়ে বেড়ায়,—অনেক নরকল্প দেবদেবী, কাল্পনিক আয়রল্যাণ্ডের মৃত পুরাণ, অনেক তন্ত্রমন্ত্রের কুহক।

এলিঅট্ তাই অনিবার্যকারণে বিজ্ঞানবিদ্বেষী, মানবচৈতন্যের সমগ্রতা তাঁর কল্পনায় নেই, জড়প্রকৃতি বা সমাজে সম্ভব যে মানুষের নিয়ন্ত্রণ তা তিনি মানেন না। তাঁর সুর পণ্যবিপ্লবের দ্বিধাদীর্ণ বেদনার—what man has made of man! মানুষের মনের ভাঙন মর্তলোকে চিরস্থায়ী, কারণ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে" কিঞ্চিৎ সুখসুবিধাও আছে। সুতরাং—

And hear upon the sodden floor
Below, the boarhound and the boar
Pursue their pattern as before
But reconciled among the stars.

অমানুষিক ঐ নক্ষত্রস্বর্গ আমাদের দায়িত্বের নাগালে নয়, অতএব কর্মফলহীন কর্মে কিবা লাভ? শিকার-শিকারীর প্রকৃতি নশ্বর জীবনে চিরাচরিত, তার থেকে আসে মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তার গভীর আবেদন।

এলিঅট্ অবশ্যই সাম্রাজ্যের স্তম্ভ নন, তবু তিনিও যে দায়িত্বহীন ব্যক্তি-স্বরূপের মতবাদ খাড়া করে' ইটন-হ্যারোর ব্যক্তিমাহাত্ম্য গান করবেন এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আর সমাজপারিপার্শ্বিকের প্রভাব ও সংস্কৃতির প্যাটর্নস মানবেন না, তাতে সাম্রাজ্যের পাপই প্রমাণিত। সেই পাপেই জড়প্রকৃতি বা পশুপ্রকৃতির সঙ্গে মানবস্বভাবকে এক করা ইতিহাসের চোখে মার্জনীয়, ঈশ্বরের চোখে নারকীয় ভ্রান্তি। কিন্তু আমার মন্তব্যের স্থানে এলিঅটের আশ্চর্য কবিতা উদ্ধৃত করাই বাঞ্ছনীয়:

At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;
Neither from nor towards; at the still point, there the dance is,
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity.
Where past and future are gathered. Neither movement from nor towards,
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.
I can only say, there we have been: but I cannot say where.
And I cannot say, how long, for that is to place in time.

অতুলনীয় এ কবিত্বে শ্রদ্ধা স্বতই অসীমে পৌঁছায়; ভাবি এবারে বুঝি

আইন্‌ষ্টাইন্-প্লাঙ্কের জগৎ, আধুনিক জীববিদ্যার মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞা কাব্যের গভীর রূপ পেল। কিন্তু এ পরিগ্রহণ সাময়িক, এলিঅটের দ্বন্দ্ব যে নিরাকৃত হয়নি তার প্রমাণ ভিন্নস্তরেব অভিজ্ঞতার ব্যর্থ মধ্যপদলোপী সন্ধিচেষ্টায়। গতি ও আপেক্ষিকতা এবং স্থিতিকেন্দ্র অস্বীকারের ব্যথিত ভিত্তিতে, ব্যক্তির চৈতন্যের কল্পিত তাঁর দ্বিধা :

I said to my soul, be still ; and let the dark come upon you
Which shall be the darkness of God. As, in a theatre,
The lights are extinguished, for the scene to be changed
With a hollow rumble of wings, with a movement of
darkness on darkness,
And we know that the hills and the trees, the distant
panorama
And the bold imposing facade are all being rolled away—
Or as, when an under-ground train, in the tube, stops too
long between stations.
And the conversation rises and slowly fades into silence
And you see behind every face mental emptiness deepen
Leaving only the growing terror of nothing to think about ;
Or when, under ether, the mind is conscious but conscious
of nothing
I said to my soul, be still, and wait without hope
For hope would be hope for the wrong thing ;
wait without love
For love would be love of the wrong thing ; there is
yet faith.
But the faith and the love and the hope are all
in the waiting ;
Wait without thought, for you are not ready for thought ;

So the darkness shall be the light, and the stillness
the dancing.
Whisper of running streams, and winter lightning,
The wild theme unseen, and the wild strawberry,
The laughter in the garden, echoed ecstasy
Not lost, but requiring, pointing to the agony
Of death and birth.

মর্মভেদী এ কাব্যের পরে নতমস্তকে জানাতে হয় বিচলিত হৃদয়ের সম্ভ্রম। কিন্তু ধার্মিক মরমিয়ার একি মহাশূন্য? মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সম্পূর্ণ জীবনের শেষে জীবন্মৃত্যুর ছলার দৃপ্ত স্বীকার বা পূরবীর ঐশ্বর্যের কথা—শূন্যতার অগ্নিবাষ্পে ভরা।

এ স্থির মহাশূন্যের সমস্যাই আরো সহজবোধ্য নাট্যরূপ পেয়েছে ফ্যামিলি রিয়ুনিঅন্-এ। বুড়ো লেডী মন্‌চেন্‌সে এমি-র অতীতের শোকে নাটকের আরম্ভ :

O Sun that was once so warm,
O Light, that was taken for granted
When I was young and strong and sun and light
unsought for

স্থূলবুদ্ধি আইভি বলে : আমি হলে সূর্যের পিছনে ছুটতুম, সূর্যের আশায় থাকতুম নাকো বসে। চার্লস্ বলে : এমি আমাদের বনেদী ধরণে চিবটা কাল ঘোড়া ও কুকুর বন্দুক নিয়ে কাটিয়ে শেষে ইংলণ্ড ছেড়ে কোথায় কাটাবে শীত। এমির দিন কাটে উইশ্‌উড্ প্রাসাদে ছেলের প্রতীক্ষায়। লর্ড হ্যারি আট বছর ধরে' সারা পৃথিবী ঘুরছে এক বাজে বউ নিয়ে। এগাথা বলে : তার প্রত্যাবর্তন নিশ্চয়ই হবে যন্ত্রণাকর,

I mean painful, because everything is irrevocable,
Because the past is irremediable,
Because the future can only be built

Upon the real past..................

He will find a new Wishwood. Adaptation is hard.

এমি বলে : কিছুই তো পরিবর্তন হয়নি। এগাথা উত্তর দেয় : আমি বলছি যে উইশ্‌উডে হ্যারি দেখবে আরেক হ্যারিকে। যে মানুষ ফিরবে সে দেখবে সেই ছেলেটিকে যে যাত্রায় বেবিয়েছিল। ইতিমধ্যে হ্যারি জাহাজ থেকে তার নির্বোধ স্ত্রীকে সাগরতলে পাঠিয়ে ফিরে এল। একা, তার পিছনে পিছনে গ্রীক গল্পের বিবেকরূপিনী চণ্ডভগিনীরা প্রতিশোধের খোঁজে ছুটছে, ফিরে এল বর্‌নট নর্টনের মতো উইশউডের জমিদার-বাড়ীতে। হ্যারি দেখল সেই সব চেনা মানুষ, যারা আত্মঅচেতন, যাদের মনের তীরে ঘটনার ঢেউ বৃথাই আছড়ে আছড়ে পড়েছে, আর সে নিজের মনের বালাই নিয়ে অস্থির।

হ্যারি বলে তার নিঃসঙ্গতার কথা, ভীড়ের মধ্যে একাকীত্বের বুকচাপা ভার, তার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, নিজের যন্ত্রণা। ছোট মাসী এগাথা সান্ত্বনা দেয় আর বলে :

There is more to understand, hold fast to that

As the way to freedom.

যা আবশ্যিক, তার সীমা স্বীকারেই তো মুক্তি। এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হ্যারি বলেঃ মনে হয় বুঝি তোমার মানেটা, অস্পষ্টভাবে—সেই যেমন তুমি বুঝিয়েছিলে চিমনিতে কান্নাটা বা অন্ধকার ঘরে সেই মন্দটার ভয়।

মেরি-র সঙ্গে ছেলেবেলার স্মৃতির আলাপের পরে হ্যারি বুঝতে পারে স্মৃতিজীবী বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের ভ্রান্তি :

The instinct to return to the point of departure

And start again as if nothing had happened.

Is n't that all folly ?

নাটকে এলিঅট কিভাবে তাঁর মোট প্রশ্নগুলি তোলেন এবং নিজেই জবাব খোঁজেন, সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়। কিন্তু চণ্ডিকাদের সাম্‌নে হ্যারি আবার ভয়ে আঁকড়ে ধরে বহুধা ব্যক্তিস্বরূপের অছিলা : আমি যখন তাকে (স্ত্রীকে)

জানতুম, সে আমি আর এ আমি এক নয়। চেম্বরলেন-সরকারের দায়িত্ব আর চর্চিল্ সরকারকে ভুগতে হবে না। এগাথা বৃথাই বলে' যায় যে শাস্তি এড়িয়ে অপরাধের দায়িত্ব এড়ানো যায় না :

That there is always more : We cannot rest in being
The impatient spectators of malice or stupidity.
We must try to penetrate the other private worlds
Of makebelieve and fear. To rest in our suffering
Is evasion of suffering. We must learn to suffer more.

প্রায় মার্ক্সীয় প্রজ্ঞার এ আভাসে শেষটা অবশ্য হ্যারি চণ্ডিকাদের বহির্বিষয় করতে সক্ষম হল এবং পেল মনের মুক্তি :

This time you are real, this time you are outside me
And just endurable.

এখানে হ্যারির যে ব্যাথা তার বাপমায়ের অপরিতৃপ্ত প্রেমের, সে বিষয়ে একটা কথা বলা যায়—There was no ecstasy. তাই কি এলিঅটের সারা কাব্যে শুধু প্রেমের ক্লান্তি ও বীভৎসতা—the boredom, the horror-ই আছে, প্রেমের আনন্দ, the glory শেষ dung and death-এ? এতো বড় কবির কাব্যসংগ্রহে মাত্র দুটী কবিতায় প্রেমের বিষয়ে এলিঅট্ একটু সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন—লা ফিল্লিয়া কে পিয়ান্জে এবং দি ওএস্টল্যাণ্ডের প্রথম অংশে। তাও সেখানে কবির বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রেমের চঞ্চলতা, পিয়াস, প্রেমের সম্পূর্ণতা নয়। বোধ হয় প্রেম দুই ব্যাক্তির দ্বৈতে একটী চলিষ্ণু সম্বন্ধ বলে তাতে মুহূর্তবিলাসী দেখে শুধু ক্ষণিক সক্রিয়তার অনাচার।

গীতা এলিঅটকে তাঁর কাব্যের চমৎকার রসদ জুগিয়েছে, তাই গীতার ভাষাতেই বলা যায় যে কর্মেন্দ্রিয় নিবৃত্ত রেখে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহে মনে মনে বাস করে, সে উদ্‌ভ্রান্ত জন কপটাচার করে। বলাই বাহুল্য, কাব্য আচরণ নয়, কাব্য হচ্ছে মনের অন্তরঙ্গ উদ্বেলতায়

বহির্বিষয়ে অঙ্গীকার, কাজেই কপটতা নয়, উদ্‌ভ্রান্তিই এখানে দ্রষ্টব্য। এই উদ্‌ভ্রান্তি ছাড়া এলিঅটের একাধারে আশ্চর্য সুকুমার প্রজ্ঞান্বেষণ এবং মৃত্যুর উপরে ভয়ানক ঝোঁক মেলানো যায় না। ক্ষুধা নয়, রোগ নয়, প্রেম নয়, ঝগড়া নয়, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ নয়, কারণ এসবই মানুষের সক্রিয় সাধ্যের ভিতরে, শুধু বিষ্ঠা আর মৃত্যু। মৃত্যু যে স্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক নিয়ে শোক করা যে নির্বুদ্ধিতা, সে অবশ্যই এলিঅট্ জানেন তবু কেন এত ঝোঁক? প্রাজ্ঞ কখনো বিচলিত হন না জীবিত বা মৃতের জন্য। এলিঅটের মুখ্যবিষয় নিশ্চয়ই আত্মসচেতনতার সমস্যা, আত্মসচেতনতা ও কর্মের আপাত দ্বন্দ্ব,—কর্মফল নয়,—কর্মের আর আত্মসচেতন মনের সঙ্গতির সন্ধান, বিচ্ছিন্ন জীবনের পুরুষার্থে ঐক্যের সমস্যা।

নিশ্চয়ই থিয়েটারসভার নিষ্কর্ম ঐ অন্ধকার নয়। কারণ কৃষ্ণ উবাচ যে নিষ্ক্রিয় হয়ে' বসে থাকলেও কর্মের দায় এড়ানো যায় না। প্রকৃতিজাত কারণে জীবমাত্রেই প্রতিমুহূর্তে কর্মস্রোতে চলিষ্ণু। কর্মের স্বাধীনতা কর্মের মধ্যেই, সকল কর্মের সমগ্রতায়, হে পার্থ জ্ঞানের উৎস। আগুন যেমন জ্বলতে জ্বলতে ইন্ধনকে করে' দেয় ছাই, জ্ঞানের অগ্নি তেম্‌নি জ্বলে কর্মের জ্বলার মধ্যেই।

কিন্তু হৃদয় যদি মানেনা মানা, যদি মুহূর্তেই বসে' থাকে অনড় জড়পদার্থবৎ? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যদি সোনার হরিণের মায়ায় ডাকে? সে বাসনার পরিণাম রাগে, কারণ এ পিয়াসী মন বৈজ্ঞানিকোচিত নৈর্ব্যক্তিকতায় ভেবে দেখে না কেন মুহূর্তের বাসনা চিরস্থায়ী বস্তু হতে পারে না, তাই হয় নিরাশ ক্রুদ্ধ। ক্রোধ থেকে আসে, কৃষ্ণ বলেন, ভ্রান্তি; ভ্রান্তি থেকে উচ্ছৃঙ্খল স্মৃতির দৌরাত্ম্য প্রতীকোৎসারী স্মৃতির যন্ত্রণা। যতোই বিশৃঙ্খলা, যতোই যন্ত্রণা, ততোই জীবনে অসহিষ্ণুতা—বাসনাসঙ্কুল এই যে জীবন অসম্বন্ধ, সামাজিক সমর্থন-হীন, একক আত্মজ্ঞানের দ্বন্দ্বে স্মৃতিমুখর। আর দুর্মর এই স্মৃতি।

আমার বিশ্বাস এলিঅট্‌ এই ভাবগুলিই নাট্যকাব্যে রূপায়িত করেছেন তাঁর persona (রূপায়নে শিল্পীর নাট্যরূপ বা মুখোস) সুচিন্তিত, তিনি নিজে নন, তোমার-আমার মতো সাধারণ লোকই হচ্ছে নাট্যপাত্র, বাদবিসম্বাদে উদ্‌ভ্রান্ত। তাই তিনি বলতে পারেন যে মুক্তির পথ শূন্যের পথ, মালার্মের নেতির মতো। ধর্মসাধকেরা অধ্যাত্মউপলব্ধির এ বর্ণনা মানেন না, এলিঅটের মতো সাধক নিশ্চয়ই সে বর্ণনা করতে চান নি। এ শূন্য বোধ হয় শুধু যন্ত্রণার সুর নিখাদে চড়িয়ে দেবার কৌশল।

এলিঅটের এই সমস্যা। বিজ্ঞানবিরোধী, তিনি গতিশীল জীবনে কোনো ডায়ালেক্‌টিক্‌সের হাল ধরতে পারেন না। সমস্যাটা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। টমাস্‌ ব্রাউন্‌ এই সমস্যার শিং ধরে' সমাধান করেন নিজের মতো, ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নেতিবাচক ছিল না, বিজ্ঞানেও ছিল আস্থা; তিনি ভিন্ন স্বতন্ত্র ন্যায়বিশ্বের মতবাদে সমাধান খুঁজে পান যাতে অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান দুইই বিশ্বাস্য। মন্‌টেনের সমাধানও প্রায় এইরকম যদিচ তাতে জিজ্ঞাসার ভাগটাই বেশী। মিলটন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরই একচেটে ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁর ঈশ্বর প্রায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রূপক বল্লেই হয়। বেকন তো বৈজ্ঞানিক। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরায় সেকালে ডনের কান্নাটা খুবই করুণ—And New Philosophy Calls all in doubt. এলিঅটের অবস্থা প্রায় ডনের মতো; মনের গঠনে নেই অধ্যাত্মজীবীর ঐশ্বর্য, তবু তিনি ধর্মবাদী স্থায়ী বন্দোবস্তের মরীয়া ভক্ত। তাই এ বিচ্ছেদের, ভেদাভেদের গান। কৃষ্ণ ব্যাপারটা জানলে হয়তো বলতেন, যে জ্ঞানে সর্বজীবের বিবিধ জীবনধারা বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত, সে জ্ঞান বাসনাদুষ্ট।

বলাই বাহুল্য গীতার অপব্যবহারে আমার কিছুমাত্র আযোচিত আপত্তি নেই। এলিঅট্‌ নিজেই তো সেনেকা প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কি করে, অজ্ঞানে বা অল্পজ্ঞানের ভিত্তিতে মহৎকাব্য রচিত হতে পারে। দি ড্রাই স্যাল্‌ভেজেস্‌-

এর জমকালো গীতাব্যবহারে আমার কাব্যাস্বাদ পরিতৃপ্ত ; আর পাণ্ডিত্য না থাকায়, পাণ্ডিত্যাভিমান সংযত করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার মতে দি ড্রাই স্যাল্‌ভেজেস্‌ই কবিতাচতুষ্টয়ের মধ্যে সবচেয়ে আঁটসাঁট কবিতা। লিটল্‌ গিডিং-এর দান্তেশোভন ভাস্কর্য ও গাম্ভীর্য সত্ত্বেও এই শেষ কবিতাটী এক হিসাবে প্রত্যাবর্তন। এখানে এলিঅট্‌ শেষ করেছেন এয়র-রেড রাত্রির জাঁকালো বর্ণনার পরে নটিংহ্যামের রয়্যালিস্ট চ্যাপেলে প্রথম চার্লসের নৈশাভিযানে যখন অন্তর্যুদ্ধে রয়ালিস্টরা হেরে গেল। অবিসম্বাদী কবিত্বে এলিঅট্‌ আর্তনাদ করেছেন পার্টিরাজনীতির নশ্বরতায়। মৃত্যুতে, কালস্রোতে রয়ালিস্টও শূন্যে বিলীয়মান, কি হবে কিছু করে, লড়ে, তাই হায় হায়।

আমি শেষ করি তৃতীয় কবিতার আশাপ্রদ শেষ ছত্রে :

We content at the last
If our temporal reversion nourish
(Not too far from the yew tree)
The life of significant soil.—প্রুফ্রকের আত্মসচেতন নিষ্ক্রিয় কৈশোর থেকে এ কবি পরিণতির দীর্ঘ মহাপ্রস্থান নমস্য কীর্তি।

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

আমাদের সভ্যতার ইতিহাসে দেশ ও কাল, টাইম ও স্পেস্ কি করে মানুষের মনে প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, তার বিবরণ আজকাল পণ্ডিত ব্যক্তিরা দিচ্ছেন। বহির্জগতের সম্বন্ধসজ্ঘাতে এই সব প্রত্যয় জাগে আমাদের মনে। সভ্যতার আর একটি বড় প্রত্যয় হচ্ছে ব্যক্তিত্ববোধ। কি করে সমাজে ও ব্যক্তিত্বে দ্বন্দাশ্রয়ী সম্বন্ধেব দীর্ঘ ইতিহাসে এই ব্যক্তির স্বরূপ মর্যাদা পেতে লাগল, তার ব্যাখ্যা সভ্যতারই ইতিহাস। বহির্জগতের বিরুদ্ধশক্তি, অন্ধপ্রকৃতি, জন্তুজানোয়ার, হিংস্র গোষ্ঠীর দলাদলি যতদিন না মানুষের শুভবুদ্ধির কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা পেয়েছে, ততদিন ব্যক্তির এই মহিমা কবিদের মনেও আসেনি। বাল্মীকি বা হোমর্ গোষ্ঠীর মহাকাব্য রচনাই করেছেন, রবীন্দ্রনাথই বল্‌তে পেরেছেন ব্যক্তির স্বকীয়তার কথা :—

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা!
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে

জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ে যে বোধ থেকে এই আশার জন্ম, সে বোধ মানবসভ্যতার বিশেষ একটা পরিণতিতেই সম্ভব। কিন্তু এখনও সম্ভব নয় এই আশাকে সকলের পক্ষে সফল করা। ব্যক্তির এ স্বাধীনতা কোথায়, যেখানে অর্থের প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিত্বই পণ্যদ্রব্য মাত্র? বাণিজ্যচণ্ডীর তাড়নায় তাই রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়েছে :

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী,
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা!

সকল সচেতন মানুষের মধ্যেই তো অন্তরের ধ্যানখানি আপনার ভাষা খোঁজে। কিন্তু জীবনযাত্রার অমানুষিক রথচক্রঘর্ঘরে সে ভাষা ডুবে যায়, মন ভবিষ্যতে খুঁজে বেড়ায় তার সম্পূর্ণ বাণী।

ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে আমার মনে পড়ে ইংরেজি কবি এলিঅটের ধরতাই বুলি :—অতীত ও ভবিষ্যৎ দুয়ের অঙ্গুলি নির্দেশ একদিকে—এই বর্তমানে। বর্তমানের উৎসারিত স্বপ্নের সৃষ্টিই তো আমাদের ভবিষ্যতের ছবি—নানা স্বপ্নের ঐক্যতান, দুঃস্বপ্নেরও। বর্তমান যদি কিছুমাত্র সুস্থ হত, তাহলে হয়ত আমাদের স্বপ্নপ্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত! কিন্তু নানালোভে ক্রুরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত। অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধ্য রোগে, অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই ঐক্যতান ছিন্নভিন্ন অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে। কিন্তু জীবন তবু হার মানে না, তার শিকড় আমাদের মনের গভীরে, দুর্মর প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক আবেগে নির্নিমেষ

চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়, অবশ্যম্ভাবিতায় বীজকম্প্র নীল অন্ধকারে বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন। বিসম্বাদের মধ্যেই উজ্জীবনের সমাধান হেঁকে যায়, উদয়াচলে মেশে অস্তাচলের রক্তস্রোত, ভগ্নদূতের মুখে জাগে প্রবল আশা, প্রাণের কবি অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীকালের ভাষা!

ব্যাপারটা নিছক কবিত্ব নয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য এর পক্ষে। বিজ্ঞান এর সমর্থক। আর বিজ্ঞান আজ আমাদের সারা বিশ্বে বাহুবিস্তার করেছে, আজ আর বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে শেষ নয় বা স্বতন্ত্র পেশা বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞানে আবদ্ধ নয়, আজ তার ব্যাপ্তি প্রায় জীবনের মতই গভীর ও জটিল! কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই প্রচণ্ড ব্যাপ্তির মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষে একতার বহুধা বন্ধন, বাহির ও ঘরের, দেহ ও মনের, ব্যক্তি ও সমাজের, বস্তু ও রূপের হরিহর আলিঙ্গন!

আর বিজ্ঞান বলতে এই ছবিই তো আমাদের মনে জাগে। ভবিষ্যতের স্বপ্নে এই বিজ্ঞানই, আধুনিক বিজ্ঞানই জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আজ যেখানে মানুষ লোভে পড়ে' বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে না—পাছে মুনাফার হার কমে যায়, সেখানে বিজ্ঞানকে দূরে পরিহার করার ইচ্ছাটা আমার মতো লেখকশ্রেণীর অসহায় জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতির স্তরকে ছাড়িয়ে যখন আমরা মানুষের স্তরে পৌছতে চাইছি, তখন এ আশা অমূলক নয় যে জীববিদ্যায় মনোবিদ্যায় নির্মাণকার্য আরম্ভ হবে মানুষকে নিয়ে। জীবিকা বা জীবনযাত্রার শূলে চড়ানো আজকের মানুষ নয়, স্বাধীন জীবনের পটভূমিতে নিছক মানুষ। অর্থাৎ দুজন মানুষের মধ্যে প্রভেদটা কেন হবে অর্থনীতিগত কারণে, তাদের জীবনযাত্রার আবশ্যিক প্রভেদের জন্য? কেন হবে না দুজন মানুষের শারীরিক মানসিক ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের জন্যে, নিছক মানসিক কারণে? অবশ্য সাহিত্যের কারবার চিরকালই চলেছে মানুষকে নিয়ে, ব্যক্তিস্বরূপ বা পার্সনল্যাটিকে নিয়েই।—কিন্তু সে

মানুষ প্রায়ই হয়েছে তার জীবনযাত্রার দাসানুদাস, ব্যক্তিস্বরূপ বিড়ম্বিত হয়েছে বহিঃসমাজের চাপে, আকস্মিকতায়।

ধরা যাক্ প্রেমঘটিত ঈর্ষ্যার কথা। ওথেলো নাটকের মুখ্য ভাববস্তু সম্ভবত চিরকাল নরনারীর সম্বন্ধে যন্ত্রণার উৎক্ষেপ আনবে, কিন্তু ঈর্ষ্যার যে বিশেষ চেহারা ঐ নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে ও তাদের কর্মধারার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তা হয়তো পরিবর্তনশীল। ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে ওথেলোর মুরিশ মত্ততা, ইয়াগোর কুটিল স্বার্থপরতা, ডেস্‌ডিমনার অসহায় অবলা ধরণ ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ নিতে পারে ব্যক্তিত্বের ভিন্ন প্রতিষ্ঠায়। মধ্যযুগের দিকে তাকালেই আমরা এই ভিন্নরূপের একটা আভাস পাই, দান্তের মুখে পাওলো ও ফ্রানচেস্‌কার অবৈধ প্রেমের যে ভাষ্য, সে পুরুষার্থ মধ্যযুগের ধর্মের ছকে ফেলা সামাজিক জীবনেই শোভন। কিম্বা ক্রবাদুর কবি প্যের ভিদাল্‌কেই ধরি, বৈষ্ণব কবির মতো ক্রবাদুর রীতিতে পরকীয়াকে উপলক্ষ্য করে প্রেমের কাব্যসাধনা চলিত ছিল, কাউণ্টেস্ লোবা তাই হেসেই প্যের ভিদালের কবিতা শুনতেন, ভিদালের আজগুবি খেয়ালে কাউণ্টও কখনো বিচলিত হন্‌নি। এমন কি ভিদাল্ যখন আবেগে আত্মবিস্মৃত হন, এবং লোবা নিজেই কবির বিরুদ্ধে নালিশ জানান্, তখনও কাউণ্ট ব্যাপারটা হেসেই ওড়াতে চান্, কারণ ক্রবাদুর রীতিই যে প্যের ভিদালের এই আতিশয্যকে সম্ভব করেছিল। সেই রকম বলা যায় যে বিধবাবিবাহ যদি সত্যই সমাজে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তাহলে কি রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"র রূপ ভিন্ন হয়ে যাবে না? ছেলে-মেয়ের কাছে ভালোবাসার দাবী বৃদ্ধ মাবাপের মনে বরাবর থাক্‌বে; কিন্তু কিং লিয়ারের ট্রাজেডির মধ্যে কতখানি অংশ জুড়েছে রাজত্বের ভাগবাটোয়ারা? এমন কি এড্‌মণ্ডের মধ্যেও তো জারজ সন্তানের গ্লানি এবং পৈতৃক সম্পত্তির লোভটাই সবচেয়ে উগ্র আবেগ।

সাহিত্যের অবশ্য স্বায়ত্বশাসনের দিকে ঝোঁকটা দীর্ঘকালের, তাই

এইসব বহির্জাত কারণকে, আকস্মিক সামাজিক হেতুকে সাহিত্যিকরা বরাবরই দাবিয়ে রেখেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন মানুষকে, ব্যক্তিকে। তাই আমাদের মনে থাকে না যে গোবিন্দলাল বা রোহিণীকে স্বাধীন মানুষ বলার চেয়ে লোভের পুতুল বলাই সঙ্গত। এই অসঙ্গতি এড়াবার জন্যেই সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকত, না হয় থাকত প্লটের মাহাত্ম্য। প্লটের সম্মোহনে আপাতস্বাধীন মানুষও জীবনমৃত্যুর কাছে নিজেকে দিত বিকিয়ে। কিন্তু সাহিত্যেব নিজস্ব ঐতিহাসিক বিকাশে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল সাহিত্যের আত্মমর্যাদা। ফলে আধুনিক সাহিত্যে প্লট্ গৌণ, চরিত্র বা ব্যক্তি ও তার সঙ্গে জড়িত আবহাওয়াই মুখ্য। কিন্তু সমাজ এখনও সেই পুরোণো আর্থিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই চলেছে, ফলে এই আধুনিক সাহিত্যের স্বাধীন ব্যক্তিরা এতই স্বাধীন যে তাদের বহিরূপ প্রায় নেই বল্‌লেই চলে, আছে শুধু তাদের মনের অন্তরঙ্গ স্বাধীনতা।

সে স্বাধীনতা শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় মনোবিজ্ঞানের অচেতন বা অবচেতনে এবং সে নিরাকার জগতে রামশ্যামকে আলাদা করে চেনা শক্ত। ফলে ব্যক্তিত্বের নির্বিশেষ সন্ধানের শেষে দেখি ব্যক্তিত্বলোপ। কারণ সাহিত্যের উপজীব্য শূন্যে ঝোলানো নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব নয়। সে ব্যাপারটা বাস্তবে টেকেও না, নিরালম্ব ব্যক্তিত্বএকটা abstraction এবং সাহিত্যের কাজ প্রত্যক্ষ নিয়ে, বাস্তব নিয়ে। সাহিত্যে চৈতন্যের স্রোত বা Stream of consciousness এর চর্চায় আমরা শিখেছি অনেক কিছুই, কিন্তু সে পরীক্ষায় আর বিকাশের পথ রুদ্ধ।

বিকাশের পথ ব্যক্তিত্বের নবনব উন্মেষে নূতন নূতন বিস্তারে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে সম্বন্ধ যাতে আকস্মিকতা-দুষ্ট না হয়, যাতে মধ্যযুগের বৃত্তিতে সীমাবদ্ধ না হয়, যাতে একালের প্রতিযোগিতামূলক জীবনযাত্রায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন না হয়, তার জন্য

চাই বিজ্ঞানশুদ্ধ মনুষ্যধর্ম। যে ধর্মে অর্থকরী বৃত্তির সুযোগ সকলের পক্ষে সমান, অবসর প্রচুর, সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিস্তৃত, ধনীদরিদ্রের, উন্নত অনুন্নত জাতির ভেদ অবান্তর; মৌরসীপাট্টা জীবনযাত্রা নয়, জীবনই সেখানে মূল্যবান। টাকা সেখানে পুরুষার্থ নয়, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ সেখানে চরম মর্যাদা পায়, বিজ্ঞান সেখানে জীবনের সঙ্গে একাকার। সমাজের সেই ভাবী গৌরবের দিনে শিল্পসাহিত্যেরও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত।

হেন্‌রি জেম্‌সের উপন্যাসের ভূমিকাগুলিতে আমরা এই স্বাধীনতার অভাব ও জেম্‌সের স্বকীয় সমাধানের চমৎকার ব্যাখ্যা পাই। লেখকের স্বকীয় সুরবিস্তার কাম্য যে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজের পটভূমিগত জটিলতায় ও ভেদাভেদে সে বিস্তার হয় বারম্বার বিড়ম্বিত। রূপকথায় যে স্বাধীনতা দেখি সে কল্পনার বা রূপায়নের মুক্তি হয় ব্যাহত। জেম্‌সের অননুকরণীয় ভাষায়:—

Yet the fairy tale belongs mainly to either of two classes, the short and sharp and single, charged more or less with the compactness of anecdote (as to which let the familiars of our childhood, *Cinderella* and *Blue-Beard* and *Hop O' my Thumb* and *Little Red Riding Hood* and many of the gems of the Brothers Grimm directly testify), or else the long and loose, the copius, the various, the endless, where dramatically speaking, roundness is quite sacrificed—sacrificed to fulness, sacrificed to exuberance, if one will ; witness at hazard any one of the Arabian Nights. The charm of all these things for the distracted modern mind is in the clear field of experience, as I call it, over which we are thus led to roam.........

Nothing is so easy as improvisation, the runing on and on of invention; it is sadly compromised, however, from the moment its stream breaks and bounds and gets into flood... To improvise with extreme freedom and yet at the same time without the possibility of ravage, without the hint of a flood, to keep the stream, in a word, on something like ideal terms with itself—এই স্বরবিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আজকের শ্রেণীগত জীবনযাত্রার বাহ্যরূপ, মানবেতর ভেদাভেদ, অহেতুক সম্ভবঅসম্ভবের মানদণ্ড। আমাদের ভবিষ্যতের ছবি তাই অর্থনীতির পরের স্তরের মানবজীবনে খুঁজি, যেখানে জীববিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান অর্থোত্তর নিছক মানবসমাজের পুরুষার্থ নির্মাণে কর্মঠ। সেখানেই রিল্‌কে-র নিঃসঙ্গতা ও জীবনের ঘনিষ্ঠতা একাধারে সম্ভব, সেখানেই প্রুস্তের স্মৃতির ইমারৎ, জয়েসের ভাষার বিহার ব্যক্তিগত চেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান প্রত্যক্ষ জীবনের মুক্তিতে মনের গভীরতর সার্থকতা পায়। কাফ্‌কার মানসিক দ্বন্দ্ব সেখানে রূপকে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন মানে না।

এ কথাটা শুধু কাব্যউপন্যাসের বিষয়বস্তুর সীমা বিস্তৃত হবে বলেই বলছিনা! লেখকে পাঠকে যোগ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় লেখকের শিল্পচর্চার স্বাধীনতাও বৃদ্ধি পাবে। কনটেণ্টের সীমানা সেখানে জানা বলে শিল্পী তদ্গত হতে পারবে ফর্মের ধ্যানধারণায়। তাছাড়া মানতে লজ্জা নেই, বই বিক্রীর বা লেখকদের সমাদর যে ভবিষ্যতে কতখানি হতে পারে, সোভিয়েট ইয়ুনিয়নে আমরা এরই মধ্যে তারকিছু দেখতে পাই এবং সে বিষয়ে আমরা যে কিঞ্চিৎ আগ্রহান্বিত, সেটা স্বীকার্য। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা মানুষের সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা পাব আরো ব্যাপক জ্ঞান, আরো গভীর অনুভবশক্তি। তাই আজ কবিরাও আপন গরজে সে দীপ্ত ভবিষ্যতের নির্মাণে মন দেয়।

পরিবর্তমান এই বিশ্বে

পরিবর্তনের সাক্ষ্য আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতার নানা স্তরে। সে পরিবর্তন যেমনি দ্রুত আর তেমনি জটিল ও গভীর। শিল্প-সাহিত্যেও এ অভিজ্ঞতা সক্রিয়। সেখানে বরং ব্যাপারটা আরো অসরল, কারণ শিল্প-সাহিত্যের নিজস্ব স্বভাব ও ঐতিহ্যের গুণে অভিজ্ঞতা বিশেষ বিশেষ রূপ পায়।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই প্রচণ্ড ব্যাপ্তির মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষে একতার আভাস। বিপরীত হয়ে উঠেছে আত্মীয়, ঘর বাহির, পর আপন। আশ্রমবাসী মৃগস্নুকুমার সিম্‌বলিস্ট পরিণতি পাচ্ছে মার্ক্সিসমে। তাছাড়া, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের, ন্যায়বিশ্বের ঘনসন্নিবেশ। এই প্রতিবেশিত্বের দৃষ্টান্ত মেলে সদ্যমৃত স্যুররেয়ালিস্‌মের কাব্যেচিত্রে, শোএন্‌-বর্গের বা হাবার সঙ্গীতে। সিম্‌বলিস্ট্‌ কাব্যে, সেজানের চিত্রে ও দ্যবুসি থেকে রুসেল অবধি-ফরাসী সঙ্গীতেও এই গ্রাম-সম্পর্কের আত্মীয়তা। পিকাশো যে কবিতা লেখেন ও স্ট্রাভিনস্কি যে তাঁর বন্ধু, সেটা আকস্মিক নয়, যেমন নয় তাঁর ফ্যাশিস্ট-বিদ্বেষ। এস্‌, গীডিঅন্‌ যে (Space, Time and Architecture-এ) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তা যথার্থ। যদি কারো শুধু আধুনিক সঙ্গীত ভালো লাগে অথচ আধুনিক কাব্য বা চিত্র অসহ্য মনে হয়, তাহলে তাঁর সততায় বা তাঁর স্বভাবের সমগ্রতায় সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

মার্ক্‌স্‌ থেকে বিকশিত সমগ্রতার পটেই কি বার্টকের হারমনির স্বরেলা এবং দেশজছন্দে বিস্তৃত আধুনিকতা স্নুবোধ্য নয়? ব্লখ্‌ বা ওঅল্‌টনের বেলায় এই কথাই কি ভিন্নভাবে প্রযোজ্য নয়? চিত্রে কিউবিস্‌মের মতো সঙ্গীতে জ্যাজ্‌ পরি প্রেক্ষিতের অচলায়তন ভেঙেছে

বলেই কি রয়হ্যারিস বা কিছু সোভিয়েট সঙ্গীতের বর্তুল শব্দলহরীর তীব্র ঐক্যতান? আইসেনস্টাইনের আশ্চর্য শিল্পতত্ত্বের বই (The Film Sense) থেকে একটি উদ্ধৃতি হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না: Modern Esthetics is built upon the disunion of elements, heightening the contrast of each other: repetition of identical elements, which serves to strengthen the intensity of contrast...Repetition may well perform two functions. One function is to facilitate the creation of an organic whole. Another function of repetition is to serve as a means of developing that mounting intensity...

বৈজ্ঞানিকও এ অভিজ্ঞতার প্রকৃতি সমর্থন করেন। গেস্টাল্ট্ ও আইডেটিক্স্ মনোবিজ্ঞান পদার্থবিদের সুরে তাল মিলিয়ে বলে যে সমগ্র অংশগুলির যোগফল মাত্র নয়। কারণ Process বা পরিণতির যোগফলে নয়, সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ ক্ষেপেই অর্থের উদ্ভাস। আধুনিক বিজ্ঞানের সাধারণ তাৎপর্য ঐখানেই।

আর বিজ্ঞানের আধুনিকতা শুধু নব্যতা নয়। প্রকৃতি ও মানুষের ব্যাপক ও সূক্ষ্ম যে জ্ঞান গত তিরিশ বছরে অর্জিত, সারা ইতিহাসের জ্ঞানসংগ্রহের চেয়ে পরিমাণ তার বেশি। কিন্তু এই বৃহত্তর জ্ঞানের উপলব্ধি সমাজে কমেছে আর তার প্রয়োগ হয়েছে দুষ্ট। শুধু বিজ্ঞান আজকাল জটিলতর বলে নয়, বিজ্ঞান আজ পেশা হয়েছে বলেও। বোঝাই যাদের পেশা, বুঝুক তারাই, বিজ্ঞান তো আজ প্রায় পণ্যদ্রব্য। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগে জগচ্চিত্র দেখতে ও গড়তে যদি হয়, তাহলে কপালে আছে গত আটদশ বছরের মতো অনেক দুঃখ, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, প্রতিষেধ্য রোগে মৃত্যু, নানা বঞ্চনা।

দ্রুত পরিবর্তনে উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্বে তাল কেটেছে বস্তুর নব নব উন্নতি আর সমাজমনের মধ্যেও। যারা বোঝে না এই পরিবর্তনের তাৎপর্য, তারাই

সাজে হর্তাকর্তা। বিজ্ঞান বা অর্থনীতি নয়, বহু দেশেই কর্তৃত্বের চাবি শুধু বর্ধিষ্ণু ও বৃদ্ধের হাতে। ফ্যাশিস্ট দেশে এঁদেরই অল্পবয়স্ক জ্ঞাতিকুটুম্বরা জ্ঞানের তোয়াক্কা না রাখলেও তার ব্যবহারে তৎপর, সৃষ্টির ব্যবহারে নয়, ধ্বংসের কলাকৌশলে।

শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে এই। বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে সম্ভব আজ সকলের হাতে খাদ্য দেওয়া আর সম্ভব কাজ, ভবিষ্যৎ ভরসা, স্বাধীনতা। কিন্তু পাতে শুধু পড়ছে নানা দুর্ভোগ, রক্তপাত, অনাহার আর অত্যাচার। বিজ্ঞানের সাহায্যে ঠিক বাস্তবে কতখানি পরিবর্তন সম্ভব তার বোধ যতো বিস্তার পাবে, বর্তমানে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে ততো বেশি, কপালফেরের ক্ষমতা ও ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যর্নালের মতে বিজ্ঞানের বিদ্যালয়প্রচলিত চিত্রটির স্থান বৈজ্ঞানিকের যাদুঘরে। নিরালম্ব শূন্যে সত্যের সাধনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে রজ্জুভ্রম।

তবু দ্রুতগতির জন্য দুর্বোধ্যতার অভিযোগ মানতে হয়। বিংশশতাব্দীর বিকাশের মাত্রায় অষ্টাদশ অতিবিলম্বিত। ধরা যাক কোয়াণ্টাম্‌তত্ত্ব, যাতে অণু ও অণুকণার গঠন ও প্রক্রিয়ার ধরণ বোঝা যায়। তার ফলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের জাতিভেদ ঘুচে গেছে। জীবরসায়নের আরম্ভে আরেক পরিবর্তন নিহিত, প্রাণবন্ত সব কিছুর রসায়নিক ভিত্তি; ক্রোমসোমে উত্তরাধিকারের জড়গত অস্তিত্ব; তারপরে আছে জন্তু ও মানুষের আচারের বিজ্ঞান, যার জন্য শক্তিমদগর্বিত পরাবিদ্যার শেষ তুরুপ—মনের স্বাধীন বিভাগও আজ অচল।

বিজ্ঞানের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন আমূল ও দ্রুত পরিবর্তন আগে কখনো দেখা যায় নি। অবশ্যই শরীর ও মনের বিচ্ছিন্নতা আজ অস্বীকৃত। তাই প্রয়োজন হয়েছে পরিবর্তিত মানস, গ্রীক আমলের দীর্ঘ দায়ভাগ পিছনে ফেলে। প্রাচীন বৈয়াকরণিক ন্যায়ের status quo-তে আপেক্ষিকতা বা কোয়াণ্টাম্‌তত্ত্ব পাগলের প্রলাপ কিন্তু অণুকণা আর নক্ষত্রবিশ্বসমূহের আচার ব্যবহার দেখতে গেলে এরাই সত্য। এইখানেই আধুনিক বিজ্ঞানে ও শিল্প-

সাহিত্যে মিল, স্থূলযুক্তির ব্যাকরণে এঁরা বিশ্বের চিত্র মনগড়া করেন না। সরলতা নয়, সততাই লক্ষ্য।

আরেকটা অগ্রগতির চিহ্ন নানাক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। জীবন্ত কি মৃত যে-কোনো ব্যবস্থাধারায় সমগ্রের মধ্যে এমন সব বিশেষত্ব ফোটে যা স্বতন্ত্রভাবে অংশবিশেষে প্রকাশিত নয়। এক স্তরে যা আকস্মিক ঘটনা মনে হয়, আরেক স্তরে তাই সংখ্যা-বিজ্ঞানের নিয়মে স্বয়ম্প্রকাশ। নিউটনীয় বিজ্ঞানের অসংলগ্নতা ও স্বাধীনতার অতিমাত্রা আজকাল গোষ্ঠিগত যৌথ ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় রূপান্তরিত। মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের চিন্তাধারা এই বিকাশের পথ দেখিয়েছিল, শতাব্দী পরে তার উপলব্ধি হচ্ছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ আজ কাছাকাছি এসে মিল্‌ছে। বিজ্ঞানের বিলিব্যবস্থায় তাই নতুন সমস্যা, নতুন যোগাযোগের প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞের স্বাতন্ত্র্য ভেঙে যাচ্ছে সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজনে। ফলে বিজ্ঞানের বাইরের জগতে নির্ভর করতে হচ্ছে বেশি। বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্যা আজ লক্ষ লক্ষ ও ব্যবসাবাণিজ্যে উৎপাদনশিল্পে বিজ্ঞান-কর্মীর প্রয়োগ ব্যাপক ও গভীর। টাকাও আসে ইন্‌ডস্ট্রি থেকে য়ুনির্ভার্সিটির চেয়ে ঢের বেশি। তবু কেন বিজ্ঞান জনগণমন-অধিনায়ক দুঃখত্রাতার আসনে নেই? থাকা উচিত, সে কথা পুরানো, কিন্তু তবু চিঁড়ে ভেজে নি। কারণটা নগণ্য নয়, এবং আজও অতিকায় জন্তুর মতো কারণটা বর্তমান আমাদের মানব সমাজে। এটা বুঝলেই তবে এটা দূর করা সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিকও তাই আজ সমাজকে বোঝায় মন দিচ্ছে, কেন সমাজকে উন্নত করায় শক্তিশালীর আপত্তি। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও সাহিত্যিকদের বা রাজনীতিকদের মতো নানান্ ঝোঁক। একদল ঘাড় ফিরিয়ে চান সেকালকে, ধর্ম, দেশাচার, পারিবারিক পরমার্থ। নাৎসিরা এই কথা স্বজ্ঞানে বলত, অসহায় পেত্যার মুখে এর প্রতিধ্বনি শোনা যেত, ইংলণ্ডে আমেরিকায় ভারতবর্ষে কণ্ঠের চাষ করে যাঁরা খান্, তাঁরা একথা প্রায়ই বলে থাকেন। কিন্তু আত্মসম্পূর্ণ চাষীদের খণ্ড খণ্ড গণ্ডগ্রামের সামাজিক ভঙ্গী আজ কোনো যুক্তিতেই মানায় না।

বৈজ্ঞানিক আরেকদল, বলা যায়, উদারনীতিক ছুঁৎমার্গে বিশ্বাস করেন। এঁরা একাকীত্বের স্তব্ধতায়, নিরালম্ব সত্যে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের ঐতিহ্যের গায়ে তার সামাজিক উৎসের গন্ধ আজও ধুয়ে যায় নি। ক্যাপিট্যালিস্‌মের একক ব্যক্তিমাহাত্ম্য এবং বুদ্ধির স্বাধীন খেলা তাই এখানেও তার প্রভাব রেখেছে। এই যুদ্ধের সর্বজাতিব্যাপী প্রস্তুতিতে অবশ্য লিবরাল এ বিজ্ঞান-মূর্তিটি ভেঙেছে। যুদ্ধকালীন এই প্রসার শান্তির মহত্তর প্রস্তুতিতে চলবে এবং তাতে বৈজ্ঞানিকের খাঁটি জ্ঞানচরিত্র নষ্ট হবে না, এটা কি দুরাশা? সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশ বছর ধরে তো এ আশা দেখা গেছে বাস্তবে সফল।

অবশ্য জীবনযাত্রায় যে দল নেতৃস্থানীয়, সেই নেতৃত্ব বিজ্ঞানের কর্মধারাও প্রচ্ছন্নভাবে নির্দেশ করে। সমুদ্রযাত্রী ব্যবসায়ীর যুগ সপ্তদশ শতকে তাই বিজ্ঞান মাথা ঘামিয়েছিল দিগদর্শন ও বন্দুক জড়িত বিষয়ে। অষ্টাদশের শেষে কলকারখানার ইশারায় হল রসায়নের চর্চা ও তাপমানের সাধনা। উনবিংশে এল বিদ্যুৎশক্তির নেতৃত্ব। আজ শুধু একটা নতুন পুরুষার্থ এসেছে, অজ্ঞান নেতৃত্ব আজ স্বজ্ঞানে ব্যবহার্য।

বিজ্ঞানের জড়বাদে আর মন ও বস্তুজগৎ, রস ও রূপ, ম্যাটার ও ফর্মের আত্মচেতন দ্বিধা নেই। নীডহ্যাম্‌ বলেছেন ভালো: গ্রীকরা, বিশেষত আরিস্টটল সব কিছুই দেখতেন গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ শিল্পের ভাষায়। ভাস্কর্যে প্রতিভাত হত একপক্ষে বস্তু, শৃঙ্খলাহীন, নিরাকার মর্মর পাথর কি মাটি; অন্য পক্ষে রূপ, আকার। সুন্দর পুরুষ কি মেয়ের রূপ, যা শিল্পীর মন থেকে আনতে হয় বর্বর পাথরের মধ্যে প্রচণ্ড প্রহারের ঘায়ে। রূপাকার তাই রূপবস্তুর চেয়ে মূল্যবান, প্রায় স্বয়ম্ভূ। ভারতীয় শিল্পকলাতেও ভাস্কর্যের উৎকর্ষ আর ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রেও তাই প্রেরণা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ আর শুদ্ধ রূপ acrhetype বা Form দৈবত, অলিম্পীয় বা কৈলাসভাবনা। টমিস্ট দর্শনেও দেবদূতরা এ কাজের ভার নেন। ভাববাদীর সমস্যার আরম্ভ এখানেই। ক্রোচের ভাববাদী অপিচ প্রশংসনীয় দ্বিধা-সন্ধির চেষ্টা

আংশিক সমাধান হলেও আধুনিক—ব্রান্‌কুসি বা হেন্‌রি মূরের শিল্পে এ সমস্যা নেই, আকার ও বস্তু সেখানে দ্বৈতাদ্বৈত।

কিন্তু গ্রীকদের এই রূপবিলাসে হয়েছিল জীববিদ্যার লাভ। চোখের সাহায্যে তারা এনেছিল শ্রেণীকরণের ক্ষমতা যদিও ব্যাখ্যা হয়তো প্রায় হত ভ্রান্ত। ১৬৪০-এর আগে অবধি আরিস্টটলের ব্যাখ্যাই য়ুরোপে চলত—গর্ভস্থ ভ্রূণের বিকাশ নাকি প্রায় মর্মরমূর্তিরই পরিণতি, বস্তু হচ্ছে রক্ত, রূপায়ন পৈতৃক বীজকল্প। কিন্তু আপনার শরীর তো হর্মিস্‌-মূর্তি নয়, আমার হাতটা যেমন পেন্সিলের কাঠ নয়। জীবন্ত শরীর চরম ব্যাখ্যায় ইলেকট্রন্‌ প্রটনের সমষ্টি নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার গঠন ও প্রাণব্যবস্থার কলাকৌশল ফাইডিঅস্‌ মূর্তির চেয়ে অনেক বেশি জটিল ও গভীর। তাছাড়া বড়ো কথা হচ্ছে, জীবশরীরে তথা আধুনিক নন্দনতত্ত্বে রূপ ও রস, বস্তু ও আকার অঙ্গাঙ্গী।

জ্ঞান যেন তিনমহলা বাড়ী, বাইরে দেখা যয়ে স্থূল চেনা রূপগুলি—মানুষে বাঁদরে, বাঘে গরুতে যেখানে মিল নেই। তারপর এই চর্মচক্ষেই দ্রষ্টব্য চর্মতলস্থ, চেরা যায় এমন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। জীবাণুবীক্ষযন্ত্রের মহলে আবার নতুন জগৎ, কোটি কোটি প্রাণবল্লী কোষ, যারা সমগ্রের বাইরেও খণ্ড জীবনের শক্তিধর। ফর্মের দিকে এই কোষের তলার কোঠায় যে মেদবর্তকণা তার সন্ধানের দাম কম হলেও, কোষচক্রের অন্তরঙ্গ ক্রোমসোমে দায়ভাগবহ উত্তরাধিকার নগণ্য নয়। এই অণুগোষ্ঠীর জীবনে চলে অণুদের সঙ্গীত, ছোটখাটো সৌরমণ্ডলের মতো তানমানলয়িত সঙ্গীত বললেই হয়। প্রোটন্‌ ইলেকট্রনদের যেন সেখানে গ্রহকক্ষবিহার চলে।

আবিষ্কারটা মৌল। ১৯১৭।১৮ সাল অবধি লোকে বলত এই রসায়নিক তত্ত্বটি কল্পনা। হার্ডি ও ল্যাংমিউরের একাণুগোষ্ঠি ফিল্‌মে এ তত্ত্ব প্রমাণ হল প্রত্যক্ষে। দীর্ঘ হাইড্রোকার্বন রেখা দেখা গেল সত্যই দীর্ঘ; জলের উপরে অম্লের মেদ-শৃঙ্খল সত্যই আটকে থাকে, এদিকে তার

অম্লভাগ জলের তলায় মিলিয়ে যায়। কৌটা-মার্কা অণুগোষ্ঠীর কৌটাবৎই ধরণধারণ। এসব তথ্য প্রবল সমর্থন পেল ইউঅল্‌ড্‌ ও ব্র্যাগদের এক্স-রে প্রয়োগে, যখন অণুশৃঙ্খলার ছকের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল। সুতরাং রূপ আজও রয়েছে। আণবিকস্তরে কিন্তু এই রূপ আর ব্যবস্থামাত্রা অভিন্নপরিচয়। যে আবেগেই হোক এ মাত্রাবৃত্তে ঘূর্ণায়মান অণুদলগুলি গোষ্ঠী বাঁধে এক আপাতস্থূল রূপে। পদার্থবিদেরা বলেন এই পরমাণুগুলি মুখ্যত বিদ্যুৎ-তাড়না। অর্থাৎ স্থূলবস্তুরূপ আসলে শক্তিস্রোতপুঞ্জেরই প্রকাশ। ম্যাটার্‌ আজও বাস্তব, কিন্তু ম্যাটার ও ফর্ম আজ আর আলাদা করা যায় না। ফর্ম আজ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থারই নামান্তর, আর বস্তু আজ শক্তিপুঞ্জ, গতিশীল সম্বন্ধের রূপ।

আরেকটা মূল কথা হচ্ছে, বড়ো আর ছোটো। অণুগোষ্ঠির প্রতিবেশিত্ব। প্রোটীন-অণুগুলি বৃহৎ যেমন হাইড্রোজেন অণুকণা সব চেয়ে ছোটো। প্রোটীনের রসায়নিক কাঠামোতে জীবদেহ তৈরি আর এই প্রোটীনে দেখা যায় যে কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন অণুরা মেরুদণ্ড এবং পাশের সারিতে পাঁজরার মতো কার্বন, নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন। গত কুড়ি বছরে উদ্ভিদ জন্তু ও মানুষের দেহে সংক্রামক রোগের সন্ধানে পাওয়া গেল এই ব্যাকৃটিরিয়ার চেয়েও ছোট জীবাণু-বীক্ষণেরও অদৃশ্য ভাইরস্‌—যথা হামরোগের সংক্রামবহ অণু। এই জীবন্ত রোগাণু প্রোটীনের বিচ্ছিন্ন মৃত অণুর চেয়ে ছোট, সুতরাং তাদের গঠনব্যবস্থা নিশ্চয়ই জীবদেহের পক্ষে অভাবিতভাবে সরল। বস্তু ও রূপ, জীবন ও মৃত্যুর এখানে সীমানা মুছে যায়। ভাইরস্‌-অণু-র পা নেই বটে, কিন্তু বহু ব্যাকৃটিরিয়া ও উদ্ভিদেরও নেই। হয়তো ভাইরসের শ্বাস নেই, কিন্তু বহু বীজ ও জীবাণুর শ্বাস-ক্রিয়া নগণ্য। অন্তত জীবনের তৃতীয় লক্ষণটি ভাইরসে প্রবল পরাক্রান্ত—প্রজনন। এই জীবন-মৃত্যুর সীমান্তের কনিষ্ঠ জীবদের একমাত্র ইলেকট্রনাণুবীক্ষণেই দেখা যায়।

এখানে আরেক বিস্ময়। সচারাচর অণুরা গোলাকারে ভিড় করে' কেলাসিত হয়, কিন্তু এই ভাইরস-অণুদের চেহারা লাঠির মতো। এদের ভিড়ের পরিণামও বিস্ময়কর—তরল কেলাস liquid crystals. অর্থাৎ এরা তিন ডাইমেন্সনসের বা আকারের নয়, এক কি দুই দিকে কঠিন। টিপে ধরলে ভেঙে যায় না, এলোমেলা এক ব্যবস্থায় আবার দানা বাঁধে। ডিমের ব্যাপারটাই ধরা যাক, ডিমটা উল্‌টিয়ে পালটিয়ে নেড়ে দিলেও আবার তার আভ্যন্তরীণ আণবিক ব্যবস্থার সাম্য ফিরে আসে এবং সেই যথাকালে বাচ্চা ফোটে। কোথায় এই ব্যবস্থাপক বা নিয়ন্ত্রক, এই সমাজকর্তা? সে প্রশ্ন মুলতুবি রেখে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু এক কার্বন অণু-র কাণ্ড দেখা যাক। জীবদেহে প্রবেশান্তে মার্কামারা এই অণুদের বিচরণ লক্ষ্য করা সম্ভব। যাতায়াত বলা যেতে পারে। মৃত বিচ্ছিন্ন প্রোটীনে নয়, মস্তিষ্কের বা পেশীর জীবন্ত প্রোটীনে ফস্‌ফোরাস্ বা নাইট্রোজেন অণু ঢুকে পড়তে পারে, বেরোতে পারে, শরীরের ভারসাম্য তাতে অবিচলিত থাকে। এ রকম যৌথবৃত্তিতে, অণুস্তরে হলেও, নীডহ্যামের মতে সমাজের ভারসাম্যের ছকে ব্যক্তির স্বেচ্ছা-সেবার কথা মনে পড়ে।

প্রোটন্ ইলেকট্রন্, অণু, অণুগোষ্ঠী, তার থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাণকণা, কোষ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তারপরে সারা শরীর জন্তু বা মানুষ। নীড্‌হ্যামের প্রশ্ন, ততঃ কিম্? নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থা এখানেই থামবে কেন? মনের প্রতিবেশী ভাগগুলি সমাজের যৌথ আঙ্গিক, পরিবার থেকে মানব-সমাজের বিশ্বব্যাপী ঐক্যের অমোঘ গতিও তো জীবন-যাত্রার শক্তির নিয়ন্ত্রণে দেশকাল-সন্ততিতে বিস্তৃত। অবশ্যই শুধু দেশ নয়, কারণ স্থানপাত্রের বিকাশ কালের বিবর্তনেই।

পণ্ডিত বলতে পারেন প্রগতির এ ছবি থার্মোডাইন্যামিক্‌সের দ্বিতীয় বিধিতে টেকে না। জীববিদ্যার জগৎ স্বতন্ত্র, এ দ্বন্দ্ব তাই ভাববাদীর চিন্তার বিশৃঙ্খলা। তাই থার্মোডাইনামিক মতে যে বিশ্বে ক্রমিক ব্যবস্থা কম্‌ছে, এ তত্ত্বে জীবনের প্রগতি বাতিল হয় না। তাছাড়া এই পদার্থবিদের

"অব্যবস্থা" নীড্‌হ্যামের মতে মিশ্রতা বা ছকের মধ্যে "অব্যবস্থা", প্রায় সোভিয়েট য়ুনিঅনে প্রাদেশিক স্বাধীনতার মতো, বা সুস্থ সমাজের স্বচ্ছল স্বাধীন ব্যক্তির মতো। তাই তিনি বলেছেন, মানুষের রাখীবন্ধনে যতো বড়ো বাধাই আসুক কূটনীতি আর মহাযুদ্ধ, স্থিরপ্রজ্ঞ সাম্যবাদী তবু হত্যার আগে গ্যালিলিওর মতো বলতে পারে "তবুও পৃথিবী চলেছে।" From each according to his capacities, to each according to his need—এ আর্যসত্যের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য।

বিজ্ঞানই সে কাজে স্থপতি। মানুষ আজ আর বস্তুমাত্র নয়, ইটের মতো মানুষ দেহমনে একটি বিকাশের জীবন্ত যন্ত্র, মানুষে মানুষে মৌলমিল, সমাজেরও নিয়ন্ত্রিত জীববৎ গতি ইত্যাদি কথা বিজ্ঞানের মোটা তথ্য। পেক্‌হাম্‌ এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের বিস্তৃত সমর্থন এ তথ্যের পিছনে। উত্তরাধিকার বা বংশধর্ম আজ একদিকে দেহমনের অভেদ্য বন্ধন ও সমাজের সন্ততি প্রমাণ করে, তেম্‌নি সেকেলে যান্ত্রিক অদৃষ্ট-বাদও উড়িয়ে দেয়। কারণ মেণ্ডেলের তত্ত্বে বলে—জন্তুর স্বভাবের মর্মে আছে আলাদা আলাদা কয়েকটি স্বতন্ত্র বংশগত বিশেষত্ব, যেমন পদার্থবিদেরা বলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন অণুতে মিলে একটি সন্তত বস্তু। ওয়াডিংটন একে বলেছেন, মিক্‌শ্চার নয়, কক্‌টেল। ফলে হঠাৎ হঠাৎ আমরা বিভিন্ন বিশেষত্ব দেখি দুই ভাইয়ের মধ্যে আর অবাক হই। কৃষিবিদ্বান তাই ফসলের বিশেষত্বগুলি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মেলান্‌ নিজের পছন্দসই ফসলের বীজপ্রস্তুতকার্যে। মর্গ্যান্‌ দেখান যে, এই জীব-দায়ভাগ আস্তানা গড়ে সূতার মতো এক বসতিতে যার নাম ক্রোমসোম। এইখানেই জীবদেহের স্বভাবে ঐক্য। জীবদৈহিক বিবর্তনের আলোচনায় এই ঐক্য বা সমগ্রতা স্পষ্ট হয়, যেমন আধুনিক মনস্তত্বে মনের বিকাশের নিরীক্ষণ থেকে ব্যক্তিস্বরূপের ঐক্য বা সমগ্রতা প্রতিভাত হল। আধুনিক জীববিজ্ঞানের এই আপাতদ্বন্দ্ব প্রথমে অনেককে বিমূঢ় করেছিল। ১৯১৮ সালে সেমান্‌ আবিষ্কার করলেন যে নিউটের আস্ত

কাঁচা ডিমে একটা অংশ থাকে যেটা বাকিটার বিকাশ চালিত করে। এর নাম হল "আদিম নিয়ন্ত্রক"। একটা ডিম থেকে এই ব্যবস্থাপকটিকে কেটে আরেক ডিমে যথাস্থানে—ভাবী উদরের অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় ডিমটি দু-জন কর্তার ইচ্ছায় কর্ম আরম্ভ করে এবং ডিমটিতে দুটি ভ্রূণ গজায়। ওয়াডিংটন এ পরীক্ষা মুরগী ও খরগোসের উপর ক'রে সফল হয়েছিলেন। জার্মানি ও আমেরিকায় মাছের উপরেও এ পরীক্ষা করা হয়।

এই নিয়ন্ত্রণকর্তার পরিচালনার কাজ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ধারার মধ্যে ভারসাম্য আনা। ইনি একাই আমাদের শিরদাঁড়া আর মগজ তৈরি করেন না, এঁর কাজ হচ্ছে স্থপতির মতো, নানা মিস্ত্রীর কাজের মধ্যে এঁর কাজ সোভিয়েট নির্মাণে কমিউনিস্ট পার্টির মতো। একটা প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে evocator. এই ব্যঞ্জনাকার শিল্পীটি নিয়ন্ত্রণকর্তার আদেশে বেরিয়ে পড়েন পাশের কোষাবলীতে এবং ফলে তৈরী হয় স্নায়ুকোষ। এই সব প্রক্রিয়াগুলি পারস্পরিক। জন্মের ৮½ মাস আগে আপনার নিয়ন্ত্রণকর্তা যদি এই জাগানিয়া জিনিসটির ৩/১০০০০০০০ ভাগ আউন্স না ছড়াতেন, তাহলে আপনার মস্তিস্ক গজাত না, হে বঙ্কিমযুগের পাঠক!

কিন্তু ঐ দ্বন্দ্ব? দ্বন্দ্ব থাকছে না, কারণ ভিন্ন ও এক স্রোতধারা, বা ধারাগুলি মিশছে মিলছে ছড়াচ্ছে, দ্বন্দ্বাত্মক তাদের ঐক্য। চেয়ার টেবিল নয়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের তরঙ্গে এর উপমা। স্টেশনের ওয়েটিংরুম নয়, আমাদের বিষয় হচ্ছে সারা ট্রেনযাত্রাটাই, বহু স্টেশনের যতিতে একটি progress বা প্রগতি। বদ্‌রাগী আর দয়ালু দুইই কি করে এক ব্যক্তির পক্ষে হওয়া একসঙ্গে সম্ভব, তার জবাব এখানে। ঐ রাগ ও দয়া মনের দুটো গতি যার ঐক্য—ধরা যাক্, রাসবিহারী ঘোষের ব্যক্তিস্বরূপের সমগ্রে। বিজ্ঞানের এই সত্তার—স্থাবরতা নয়, গতি বা বিকাশের মনোভাব আমাদের জীবনে ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছে। তাই আমরা এখন ব্যবসায়ী বল্‌তে বিরলা বা টাটার কথা ভাবি না, শ্রমিকশ্রেণী বলতে একজন শ্রমিক নয়, সারাশ্রেণীর কথা ভাবি—কারণ যে

গতিস্রোত আমাদের চোখে ভাসছে, তাকে বলা যায় শ্রেণীসংঘর্ষের ধারা। এই যে, বস্তু নয়, তার বিকাশপদ্ধতি, তার গতির উপরে ঝোঁক, এ ঝোঁক আধুনিক শিল্পসাহিত্যেও দ্রষ্টব্য। রিপ্রেসেণ্টেশনের সুবোধ্য সুবিধাবাদ সত্বেও আমরা আজ অভিজ্ঞতার গতিশীল যাথার্থ্যই খুঁজি। তাই কবিতায় গল্প থাকে না, ছবিতে থাকে না বহির্বস্তুর যথাযথ নকল। আর বিজ্ঞানে বিশ্বের ছবির কারবার একেবারে উঠে' গেছে।

আমাদের এই মাত্র দুশোকোটি বছরের পরিবর্তমান বিশ্ব! বিরাট তার দেশকালের পটভূমি, যেখানে নাকি আমাদের ছায়াপথ বা Milky way—একবার পাশফিরে' ঘুরতে পারে ৩০০,০০০,০০০ বছরে, যেখানে নাকি সেকেণ্ডে বারো মাইল করে আমরা, মাটির এনটিউস্-রা সূর্যসহ ঝাঁপিয়ে চলেছি হারকিউলিস্ পুঞ্জের দিকে। ক্রোথর্ এ বিরাটের পরিমাণ-বিষয়ে উপমা দিয়েছেন ভালো, রেলপথের মধ্যে স্টেশন প্লাটফর্মে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, মেল্ ট্রেন গেল ছুটে। এন্‌জিনের তীক্ষ্ণস্বর কেন ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজ বয়ে' আনে? অতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বর জোরালো হয় যতো কাছে আসে, সামনে দিয়ে যখন চলে' যায় তখন তীক্ষ্ণতা থেমে যেন গলা ভেঙে যায়। এনজিন্ যদি দাঁড়িয়ে থাকৃত, বায়ূতরঙ্গ তাহলে কানে ভেঙে পড়ত সমান আবৃত্তিসংখ্যায়। এনজিন্ যদি চলে, তাহলে শব্দের বেগ স্থির পরিমিত বলে' তরঙ্গগুলির পারম্পর্য হয় দ্রুততর বা ফাঁকটা হয় ছোটো, ফলে বেশি ঢেউ একই সময়ে কানের পারে আছড়ায়। স্বরগ্রাম তাতে চড়া শোনায়। স্বরের মাত্রা এন্‌জিনের বেগের মাত্রার সঙ্গে সংলগ্ন। মজা হচ্ছে নিশ্চল এন্‌জিনের স্বর যদি মাপা থাকে, তাহলে আর চলন্ত এন্‌জিনের বেগ জানতে আমাদের এন্‌জিনে চেপে বসতে হয় না, ঐ স্বরের মাত্রাতেই এন্‌জিনের বেগ জানা যায়। এতে এন্‌জিনের দূরত্বের হিসাব নিষ্প্রয়োজন।

শব্দের মতো আলোর বেলাতেও এই হিসাব চলে। চোখের রংধরা যন্ত্রে আলোর তরঙ্গক্ষেপে রংবাহার খেলে, লাল, কম্‌লা, হল্‌দে, সবুজ, নীল

থেকে বেগ নি। নিশ্চল সবুজ আলো কাছে চললে নীল, দূরে চল্‌লে হল্‌দে লাগে। এই থেকে গ্রহনক্ষত্রের আলোক-বেগ—কারা আমাদের দিকে, কারা আমাদের দিকে পিছন ফিরে, পরিমেয়। আলোর বেগ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল, এর চেয়ে ক্ষিপ্র কিছু বিশ্বে নেই। আর ফিজো দেখান্ যে, আলোর বেগ একই থাকে, তা সে বায়ুস্তর স্থির বা অস্থির যাই হোক্ না কেন। মাইকেলসন্ এবং মর্‌লির পরীক্ষাতেও জানা যায় মর্ত্যচর আলোর যাতায়াত মর্ত্যের আপন বেগের প্রভাবের বাইরে। আলোই এ অস্থির ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মকৈবল্যের অধিকারী। (আমার নামটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু বোধ হয় এলেন্ নামক এক ক্যানেডিয়ান্ অধ্যাপকের ছড়াটা এখানে উদ্ধৃতি করছি :

There was a young lady named Bright
Who walked faster than light.
She started one day
In the relative way,
And came back the previous night.)

আইন্‌স্টাইন্ এরপরে এসে দেশকালের সমস্যার উদ্যত শিংদুটো ধরলেন আর দার্শনিক-ষাঁড়টি জব্দ, দেশকালের দ্বিধা একই ষাঁড়ের দুটো শিং। দেশ ও কাল, তথা জড়বস্তু ও তড়িৎশক্তি। বস্তুপুঞ্জ বেগের আবেগে জ্বলে ওঠে আলোকসত্তায়। বেগের উপরেই নির্ভরকরে জড়বস্তুর আকার, যতোই জোরে চলা ততোই ওজনে বৃদ্ধি আর আকারে হ্রাস। আর এই আলোর তরঙ্গ যেন এই বস্তুপিণ্ডের পিঠে চাপ দিয়ে আকাশকে করে' দিলে অর্ধচক্র। যামিনী রায়ের ছবিতে যেমন, বিশ্বেও তেম্‌নি সরল রেখা নয়, জ্যাবদ্ধ বক্রটানের চল্‌তি।

তারপরে বর্ণবীক্ষণযন্ত্রের এবং বর্ণবেগমাপের যন্ত্র। স্পন্দমান অণুর আবেগ লেবরেটরিতে যে মাত্রায় চলে, সেই মাত্রাই আমাদের সূর্যে আর দূরদেশের নক্ষত্রপুঞ্জেও সেই একই মাত্রা, প্রথম যন্ত্রটি তা প্রমাণ করে।

বর্ণ-স্পীডোমিটরে জানা যায় নেব্যুলাদের ধরণধারণ। নেব্যুলা হচ্ছে দু-রকম, এক দীপ্যমান বাষ্পের পিণ্ডসমষ্টি, আরেকটি কোটি নক্ষত্রের স্বাধীন সঙ্ঘ। আমাদের কাব্যের চেনা ছায়াপথ প্রথমশ্রেণীর এক নাক্ষত্রিকপুঞ্জ, আর ঐ স্বাধীন সঙ্ঘগুলি আরো দূরে। ঐ দ্বৈপায়ন বিশ্ব-গুলির দূর নক্ষত্র প্রায় সনাক্ত করাই যায় না, তবু চেনা নক্ষত্রের মতোই তাদের আলোকক্ষেপের ভঙ্গীতে বোঝা যায় যে, ওরা কোটি কোটি নক্ষত্র দীপাবলীর শোভাযাত্রা। এদের মধ্যে নিকটতম তারার ঝাঁক হচ্ছেন আণ্ড্রোমিডা। এই বিরাট অশ্রুমতী অগ্নিশিখাও পরিমেয় এবং জানা যায় ইনি সেকেণ্ডে বিশ মাইল বেগে মর্ত্যের আমাদের দিকে আসছেন। অভিসার বলা যায়, কারণ তাঁর সহচরীরা দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছেন।

কিন্তু আলোর যাত্রার মাত্রা কি? প্রদীপের দূরত্ব জানা যায় সহজে কারণ আলোর তেজ কমে দূরত্বের বর্গ অনুসারে। নক্ষত্ররাশির আলোর ধরণ দু-রকমে জানা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান সঙ্গীর ছায়ায় নিয়মিত গ্রহণ লাগে। কোনো কোনো নক্ষত্রের বিচ্ছুরণ ছন্দিত স্পন্দনে। সেফাই-তে প্রথমে দৃষ্ট বলেই এই শ্রেণীর নাম হয়েছে সেফাইড্, এ দলে বিখ্যাত আমাদের ধ্রুবতারা এবং এর ছন্দের বৃত্ত চারদিক ঘিরে' চলে। সাহিত্যের ধ্রুবতারায় প্রেমাবেগ দেখছি নিছক ধ্রুব নয়, যদিও এই ছন্দগত ওঠাপড়া আপাতনগণ্য।

ম্যাজেলানী তারকা মেঘে শ্রীমতী লীভিট্ দেখেন এক ব্যাপার। সেটা হচ্ছে এই কোটি কোটি প্রায় সমদূর পুঞ্জের নক্ষত্রদের স্পন্দনকাল ও সূর্যশক্তির মধ্যে স্পষ্ট একটা অনুপাত। দশদিনব্যাপী উত্থান-পতন যে নক্ষত্রের ছন্দে, সে আমাদের সূর্যের চেয়ে ৯৬০ গুণ সূর্যশক্তিতে উজ্জ্বল, একশো দিনের ছন্দে ২০,০০০ গুণ উজ্জ্বলতর। যে-কোনো পুঞ্জে তাই একটি সেফাইড্ লাইট্হাউসের নিশানা থাকলে, সে নক্ষত্রগোষ্ঠীর দূরত্ব মাপা যায়। দূরত্বের কথায় বলা যায় যে, ঐ দ্বৈপায়ন দূরযান বিশ্বের যেটি খালি চোখে সব-চেয়ে বড়ো, আণ্ড্রোমিডা

নেব্যুলা, সে শুধু একটি নগণ্য তারার মতো দেখায়। আণ্ড্রোমিডা কিন্তু বিরাট একটি ছায়াপথের তুল্য, দূরত্বের মাপ থেকে কষা যায় এর আকারের অঙ্ক আর দীপশক্তি। একশো কোটি সূর্যের আলো এই আণ্ড্রোমিডার দীপ্তি। এদের কারো কারো আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পঞ্চাশ কোটি আলোকবর্ষ কেটে যায়। সব চেয়ে যে দূর দৃশ্যমান দ্বীপ বিশ্ব, সে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলেছে সেকেণ্ডে ষাটহাজার মাইল বেগে, রেডিয়ম্-ফাটানো হেলিয়ম্ অণুর চেয়ে পাঁচ গুণ দ্রুততর, আলো বা রেডিওর এক-তৃতীয়াংশ গতিতে।

এই যাতায়তের ব্যাখ্যা মিন্ দিয়েছেন। ডান-দিকের ধাবমান ছেলে আমার দিকে ছোটে ততক্ষণই, যতক্ষণ না সে আমাকে ছাড়িয়ে' যায়, তারপরে সে আমাকে ক্রমেই দূরে রেখে বাঁয়ে ছোটে। তাছাড়া বিশ্ব বর্ধমান, বেলুনের মতো। ফলে প্রথম স্ফীতির অবস্থার দুটি মাছির একটি মাছি আরো বেশি স্ফীতির পরে দ্বিতীয় মাছির থেকে আরো দূরে চলে যায়। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে কিন্তু এই বিশ্বের ছবি আঁকা যায় না। প্রতিচিত্রের যুগ গেছে। বিপ্লবীসমাজের বিজ্ঞানে পুরানো চিহ্ন সব বদলাচ্ছে। আধুনিক শিল্পসাহিত্যে এই অভিজ্ঞারই ভিন্নজাগতিক সমর্থন। বিজ্ঞানের সন্ততিবোধে আপাতদৃষ্টিতে তাই ভাঙন ধরেছে যেমন ধরেছে মানবসমাজের ঐতিহ্যবাদে। সন্ততিবোধ থেকেই কার্যকারণ সন্ধান আসে। প্রাত্যহিক জীবনে দুইই সার্থক এবং সেই থেকেই এদের সর্বত্র প্রয়োগের ইচ্ছা। কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে এ প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। ম্যাক্সওয়েল্ তাই তাঁর চাকার mangles ত্যাগ করেন যখন তার থেকে তাঁর বিদ্যুৎসন্ধান সফল হল। কারণ বিদ্যুতের আচরণ চেনা প্রতিচিত্রে বিকৃত হতে বাধ্য। ম্যাক্সওয়েলের শুদ্ধবুদ্ধি অবশ্য অসামান্য, ধর্মভীরু হয়েও তিনি বলতেন আত্মায় তাঁর বিশ্বাস আছে কিন্তু সে বিশ্বাসই পাছে ঈশ্বরের আবির্ভাবে দুর্বল হয়ে যায়, তাই তিনি অবতার মানেন নি। প্রতিচিত্রের সম্বন্ধে তাঁর এই সন্দেহ ছিল বলেই তিনি আধুনিক পদার্থবিদ্যার

জনক। ফিজো এবং মাইকেলসন্ মর্লির প্রমাণ যে আলোর গতি নির্ধারিত, স্থির। আলোর চেয়ে দ্রুত চিহ্ন নেই এবং চিহ্ন বা প্রতীকেই বিজ্ঞানের কারবার। প্রতীকের অপরিমেয় বেগ রইল না, এ এক সমস্যা। আপেক্ষিক-তত্ত্বে হল এর দুর্বোধ নিরাকরণ। দ্রষ্টার সম্বন্ধই নির্দেশ দেয় চলন্ত বস্তুর দৈর্ঘ্য, ভার ও সময়ের পরিমাণে। সেকেলে বিজ্ঞান এই প্রতীকহীন প্রতিচিত্রহীনতায় একেবারে ভেঙে পড়ল। দ্বিতীয় ধাক্কা এল প্লাঙ্কের কোয়াণ্টায়। তিনি বলেন তাপ বা শক্তি যেন বিশেষ মাপের এক এক মোড়কে থাকে। অর্থাৎ চলন্ত চাকাটা ক্রমিকভাবে বেগ বদ্লায় না, এক বেগ থেকে আরেক বেগের অনুপাতে চলে না, বিপ্লবের মতো লাফিয়ে যায়। এক মোড়ক ওষুধ খেয়ে আরেক মোড়ক, মিক্শ্চারের বোতল খুলে' ফোঁটা ফোঁটা সমানে খাওয়া নয়। ফোঁটা ফোঁটাও অবশ্য অবিরাম নয়, তাতেও স্বাতন্ত্র্য। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকেই প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম বা পরিমাণতত্ত্ব।

এর প্রয়োগ হল বহু ক্ষেত্রে। লেনার্ডের পরীক্ষায় দস্তার পাতে অতি-বেগ্নি আলো ফেল্লে বিদ্যুৎঅণু লাফিয়ে ওঠে। তার বেগ কিন্তু আলোর মাত্রা বাড়ালে বাড়ে না, বাড়ে অণুদের সংখ্যা। সমুদ্রের ঢেউএর উৎক্ষেপের সঙ্গে এ মেলে না। আইনস্টাইন তাই দিলেন বিপ্লবকর আভাস—আলোর ঐ রশ্মিগুলি তরঙ্গ নয়, আণবিক টুক্রা। প্রতি টুকরাই খানিকটা শক্তির মোড়ক বা আধার। দস্তার পাতে তারা ধাক্কা দিলে বিদ্যুৎঅণু লাফিয়ে ওঠে, সমান বেগে, কারণ আলোর টুকরাগুলির সমান নির্ধারিত শক্তি। পরিমাণ-তত্ত্ব কি প্রমাণসাইজ পণ্যের যুগেই শোভন নয়?

নীল্স্ বোর দেখালেন এই পরিমাণ নির্ধারণ থেকেই জড়বস্তু বা ম্যাটারের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য আছে। আর এই তরঙ্গ ও খণ্ড বা টুকরার দ্বন্দ্ব মিলে যায় নতুন অঙ্কে, যেখানে ক × খ আর খ × ক এক নয়। এ বীজগণিতে প্রতিমূর্তি গড়া যায় না। কিন্তু তাহলে ঐ বিদ্যুৎঅণুদের আদিনিবাস জানা যায় কি করে? হাইসেনবের্গের প্রতিভা বললে অনিশ্চয়তার নিয়মে। প

যদি হয় ইলেকট্রনের সংস্থান আর ম তার বস্তুরূপ আর বেগের ফল তাহলে প নিশ্চয় মাপা যাবে কিন্তু ম-র নির্ণয় হবে অনিশ্চিত। তেমনি নির্ণীত ম-র বেলায় প হবে অনিশ্চিত।

মোটামুটি, বিষয়-বিষয়ী দ্রষ্টা-দৃশ্যের স্বীকারে ফিরে আসি। আইন-স্টাইনের বিজ্ঞানে দেশকালের ভেদাভেদ ও চিরমূল্য নেই, কিন্তু দ্রষ্টা আবার সক্রিয়, সে নিয়ম খোঁজে ও খুজে পায়, কার্যকারণের লাঙল আবার তার হাতে। অবশ্য বোর ও হাইসেনবর্গের চর্চা বিশেষ অণু নিয়ে আর আণবিক সত্তা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ। কার্যকারণ সেই বিশেষের ক্ষেত্রে অবান্তর। তার মানে এ নয় যে, দ্রষ্টার অগম্য অণুর ধরণ ধারণ অঙ্কে ধরা পড়ে না। অঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে ভাবীকথকও বটে। বলাই বাহুল্য এসব আণবিক সত্য কোটি অণুর সমষ্টি মানুষ বা ইট কাঠের জগতের ব্যবহারিক নিয়মাবলী বাতিল করে না। কার্যকারণ দেশকাল সবই সেখানে গ্রাহ্য। অনিশ্চয়তার বিধি অনুসারে আমাদের মগজের উপরে বংশের ও পারিপার্শ্বিকের নিশ্চিত প্রভাব অস্বীকৃত হচ্ছে না। রাত্রির অন্ধকারে নৈশ পাইলটের আকাশযাত্রার কর্তৃত্ব দিনের অনেক স্পষ্ট সাফল্যের চেয়ে মহৎ। তাছাড়া, দিনের সাফল্যে বাজার বসে যায়, সেখানে অনেক গ্লানি, আত্মপ্রসাদের অনেক ক্লেদ, সোভিয়েটবিদ্বেষজ বহু ভ্রান্তিবিলাস।

সোভিয়েট শিল্প সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

রাশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশী আশা করি নি। কেননা কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েছি। ভারতের উন্নতি সাধনের দুরূহতা যে কত বেশী সে কথা স্বয়ং খৃষ্টান পাদ্রী টম্‌সন্ অতি করুণ স্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছেন। আমাকেও মানতে হয়েছে দুরূহতা আছে বই কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন? একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ার প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতই তাদের অন্তর বাহিরের অবস্থা। সেই রকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজা অর্চনা পুরুত পাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপা পড়া, উপরওয়ালাদের পায়ের ধূলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়, মাঝে মাঝে য়িহুদী প্রতিবেশীদের পরে খুন চেপে যায় তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না, উপর-ওয়ালাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুৎ, নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে তারা তেমনি প্রস্তুত। এই তো হল ওদের দশা। বর্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য, ইংরাজের মতো তারা ঐশ্বর্যশালী নয়, কেবল মাত্র ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হয়েচে। রাষ্ট্রব্যবস্থা আটেঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তারা পায় নি—ঘরে বাইরে প্রতিকূলতা। তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ

সমর্থন করবার জন্য ইংরেজ এমন কি আমেরিকানরাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করেচে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তারা যে পণ করেচে তার "ডিফিকল্টি" ভারত কর্ত্তৃপক্ষের ডিফিকল্টির চেয়ে বহুগুণে বড়ো। অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশী কিছু দেখতে পাব এ রকম আশা করা অন্যায় হোত। কিই বা জানি কিই বা দেখেচি যাতে আমাদের আশার জোর বেশী হতে পারে? আমাদের দুঃখী দেশে লালিত অতি দুর্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েচি। শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্ত্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেচে—এখানে তাই হলো, দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্চে—পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানব সমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ। আমাদের সম্রাটবংশীয় খৃষ্টান পাদ্রীরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েচেন, ডিফিকল্টিস যে কি রকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেচেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না—কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যবসাগত অভ্যাস, আলো চোখে পড়ে না বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে।

বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এই যে নবজীবনের আশ্চর্য সূচনা, তা যেমন সোভিয়েট য়ুনিয়নের সব দেশের সব শ্রেণীর মধ্যে ছড়ানো, তেম্নি শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, কারখানায়, চাষে জীবনের উন্নতির সব ক্ষেত্রেই তার প্রভাব শীঘ্রই স্পষ্ট হল। ওএব্‌দের বই পড়লে এই বিপুল ও গভীর প্রভাবের সীমানা পাওয়া যায় এবং ট্রট্‌স্কিদের কথা মনে রাখলে কি রকম ভিতরের বাধার মুখে সোভিয়েট্‌কে কাজ করতে হয়েছে, তা কিছু আন্দাজ করা যায়। কিন্তু বাইরের ও ভিতরের বহু বাধাই ব্যর্থ হল। এই নূতন

সর্বব্যাপী নির্মাণের অন্তরঙ্গ প্রেরণা থেকে সাহিত্য শিল্পও বাদ পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার বিবরণেই এই আর্টের উৎসাহ দেখা যায়।

বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের মর্যাদা জনসাধারণে ছড়িয়ে পড়ল সে বিবেচনা মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিকের মনোমতো বিষয়। অবশ্যই সোভিয়েট য়ুনিয়নে এ মর্যাদা মানবধর্মের বিকাশেরই একদিক। যে সমাজব্যবস্থায় জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষের মহত্ব স্বীকৃত এবং ব্যক্তিত্বের অধিকার অঙ্গীকৃত, সেখানেই শিল্প সাহিত্যের এ রেনেসান্স্ সম্ভব! এর জন্য রাষ্ট্রের চেষ্টার সঙ্গে শিল্পীদের সহযোগও দায়ী, আবার যে জীবনের আনন্দ ও সার্থকতা এসেছে, যার জন্য শিক্ষার হার ক'বছরে শতকরা ৯৮ জন লোকে পৌছয়, যার জন্য আঠারো থেকে চল্লিশ বছরের সবাই পড়তে পারে, সেই জীবনযাত্রার পরিপূর্ণতাও দায়ী।

এখানে শুধু শিল্প সাহিত্যের দিকটাই সংক্ষেপে দ্রষ্টব্য। রাশিয়ার সাহিত্যপ্রতিভা সবাই জানে আকস্মিক নয়। গোগোল, পুশ্‌কিন্, টুর্গেনিভ্, ডস্টএভ্‌স্কি, টলস্টয়, চেখভ বা গোর্কির বইই আমরা পড়ি। এই সব বিরাট লেখক ছাড়াও রাশিয়ান্ সাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। তার পরিচয় কিছু কিছু ইংরেজি অনুবাদেও পাওয়া যায়! লের্মন্টভ্ বা নেক্রাসভ্‌কে বাদ দিয়ে এই শতকের আরম্ভের রাশিয়াতেও সাহিত্যের পরীক্ষার যে নানারকম চেষ্টা হয়েছিল, তার তুলনা ফ্রান্সেই মেলে। ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য বা শিল্পের দল যে সৌখীন কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিল, সেটা সামাজিক কারণে খানিকটা ব্যর্থ, তিক্ত বা আসন্ন যুগান্তরের পূর্বাভাসে অস্পষ্ট চাঞ্চল্যে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। ৩৫ সালে য়ুনিয়ন ব্যাপী যে ১৫০০ লেখকের সভা হয়েছিল তাতে বুখারিন একটি দীর্ঘ ও উচ্চশ্রেণীর সমালোচনাও পড়েন। সেই বক্তৃতায় মার্ক্সিস্ট সমালোচনার বহু প্রশ্ন গোড়া থেকে আলোচিত হয়েছিল। আধুনিক সাহিত্যের বিস্তৃত সমালোচনাও এ বক্তৃতার মুখ্য অংশ। বক্তৃতাটি ইংরাজিতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিএলি, ব্লক ও ব্রিউসভের

আলোচনা আছে। এঁদের সমসাময়িক অনেকে বিপ্লবের সময়ে পালান, এঁরা নবযুগকে মুখোমুখি দেখেছিলেন। কিছু কিছু অনুবাদ পড়ে'ও এঁদের কবিত্ব ও বুদ্ধির সাহসে শ্রদ্ধা হয়। ব্লকের বিখ্যাত দ্বাদশ-নামের কবিতার অনুবাদ পাঠে পুরাতনে মানুষ এই দিশাহারা আবেগের কবির নূতন জগৎকে গ্রহণ করবার মূল্য কিছু বোঝা যায়। ব্রিউসভ্ আরও ভাল কবি এবং বুখারিনের ভাষায় "এই কোন্ দূরাগত দীপ্ত অতিথি" আজ রাশিয়ায় জনপ্রিয় ও মান্য। অকালমৃত্যুর আগে ব্রিউসভ্ লেখেন:

> Days will shine forth with matchless Maytime lustre,
> Life will be song ; a red and golden cluster
> Of flowers will bloom on all the graves that be.
> Though black the furrow, though the wind be stinging,
> Deep in the earth the sacred roots are singing—
> But you the harvest will not live to see.

পলাতকদের ছেড়ে দিলেও যে সব শিল্পী আবার মতান্তরে দেশে ফিরে যান, তাঁদের মধ্যে কুপ্রিন্, প্রোকোফিয়েভ্, মিরৃস্কি উল্লেখযোগ্য। কুপ্রিন্ আর যাই হোক, দ্বিতীয়শ্রেণীর লেখক তো বটেই এবং প্রোকোফিয়েভ পশ্চিমা সঙ্গীতের আধুনিকতার একজন ভূতপূর্ব দিক্‌পাল। প্রোকোফিয়েভের কঠিন টেকনীক্ সাধনা কি করে সর্বজন মনোরঞ্জনে গেল, সঙ্গীত জগতে সেটা স্মরণীয় ঘটনা। তাঁর শিশুদের জন্য লেখা সিম্‌ফনি সারল্যে তাঁর পক্ষে যেমন বিস্ময়কর প্রতিভার নমুনা, তেম্‌নি তাতে শিল্পের সততা বা অবৈকল্য অবিসম্বাদী। কুপ্রিন্ মস্কোতে ফিরে আবাল্য চেনা শহর প্রায় চিন্‌তে পারেন নি, নতুন বাড়ী বড়ো বড়ো রাস্তার চেহারা বদ্‌লেছে একেবারে, যেমন বদ্‌লেছে মেয়েপুরুষ। কুপ্রিন্ এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন খুব সোজাসুজি তাঁর বিস্ময় ও গর্বের বর্ণনা এবং নিজের লেখার সঙ্গে এর ভাবী যোগের আলোচনা করে।

সেটা যে কুপ্রিনের ভাববিলাস নয়, তার প্রমাণ আলেক্সিস্ টলস্টয়ের মতো

শান্ত স্থিতধী লেখকও এই কথাই বলেছিলেন মাদ্রিদে লেখক সভায় এবং সোভিয়েটে সভ্য নির্বাচিত হবার আগে। শোলোকভের মতো প্রবল স্পষ্টভাষী লেখক এই কথাই বলেন স্বদেশ বিদেশে—ইংলণ্ডে যখন যান, তখন। এ সমর্থন স্টানিস্‌লাভ্‌স্‌কির মতো নাট্যশিল্পী, মসকভিনের মতো নট, ডাইনেকার মতো প্রতিভাবান্‌ চিত্রকরের উক্তিতেও পাওয়া যাবে।

স্বকীয়তাবাদী বুর্জোয়া শিল্পবাদীদের ব্রিউসভ তাই বলেছিলেন :

That which flashed in a far-off dream
Is embodied now in smoke and thunder ;
Then why do you frown with the unsteady eye
Of a frightened roe-deer in the woods ?
Oh, to you, aesthetes, and to you, dreamers,
The dream was sweet but as the far-off distance
And only in books and in accord with the poets
Did you love originality.

আর মায়াকভ্‌স্কি তো গতযুদ্ধের আরম্ভেই লেখেন :

Where peoples's short vision is cut short
By the heads of the hungry crowds,
In the thorny crown of the revolution
The year 16 will burst in.

মায়াকভ্‌স্কির বজ্রনির্ঘোষ বিপ্লবের আগে বুর্জোয়া আত্মপ্রসাদের বিপক্ষে বেজেছিল—পাব্লিকের রুচির মুখে থাব্‌ড়া তাঁর এক বইএরই নাম। তখন অবশ্য তাঁর বিদ্রোহ সৌখীন সাহিত্যের প্রবল কিন্তু গণ্ডীবদ্ধ আস্ফালনেই শেষ হত। যখন তাঁর প্রবল কণ্ঠস্বর সত্যকার উপলক্ষ্য পেল, শ্রোতা পেল, তখন কবিত্বের বিপ্লব প্রাণ পেল বিপ্লবের কাব্যে। তাঁদের মাসিকপত্র Lef-এর চেহারাই বদ্‌লে গেল। তাঁর সহকর্মীরা যে সমান

তালে চল্‌তে পারলেন, তা নয়। খেভ্‌নিকভ্‌ তাঁর ভাষার উৎসসন্ধানে জয়্‌সের মতো ধাঁধাঁয় ঘুরে' মারাই গেলেন। আসেইএভ্‌ বা কামেন্‌স্কিও হয়তো আশা পূরণ করলেন না। কিন্তু মায়াকভস্কির অট্টনাদ য়ুনিয়নের শেষ প্রান্তে চীনেও পৌছল। আজ নির্মাণের বাস্তবজগতে নেতিমূলক agitverse-এর মূল্য নির্ণীত, কিন্তু আজও মায়াকভ্‌স্কির ছন্দবিস্তার ও জটিল টেক্‌নীক নিয়ে লেখক পাঠক মাথা ঘামায়, যেমন ঘামায় স্বকবি পাস্টেরনাকের প্রতীক প্রয়োগের কঠিন ভাবানুষঙ্গের রহস্যোদ্ঘাটনে। মায়াকভ্‌স্কির আত্মহত্যা বিষয়ে অনেক মিথ্যা গুজব বিদেশে রটেছিল। আসলে এই আত্মহত্যার কারণ ব্যক্তিগত ট্রাজেডি। ভাঙার আন্দোলন যখন সংহত নির্মাণ প্রচেষ্টায় জমে' গেল, মায়াকভ্‌স্কির অস্থির প্রতিভা তাতে তৃপ্তি পেল না। তিনি Lef থেকে Ref-এ এলেন, প্যারিস গেলেন, মঁপার্‌নাসে পান করলেন, মনাকোতে জুয়া খেল্‌লেন, মস্কৌ ফিরে কয়েকমাস পরে আত্মহত্যা করলেন। প্রেম বা ব্যক্তিগত সব কিছুই তিনি নিজের ছক্‌ থেকে বাদ দিয়েছিলেন, অন্যকেও বলেছিলেন—তাঁর Command to the armies of art-এ :

> I don't believe in flowery Nice! I sing once again of men as crumpled as hospital beds and women as trite as a proverb.

আর আত্মহত্যার আগে লেখেন :

> As they say, 'the incident is closed.' Love boat smashed against mores. I'm quits with life. No need itemizing mutual griefs, woes, offences. Good luck and goodbye.

স্টালিন তাই মর্মাহত হয়ে বল্লেন যে কম্যুনিষ্ট কবিদেরও "সমগ্র মানুষ" হতে হবে। উৎসাহের ছাঁটাই করা বিশুদ্ধতা পরিণামে করুণ তো হবেই প্রকৃতির প্রতিশোধে।

এসেনিনের কবিপ্রতিভা মায়াকভ্স্কির মতো নয়। তাঁর মন গ্রাম ও গ্রাম ছাড়া রাঙামাটির পথে উদাস হয়ে যেত। লোকসাহিত্যের সরসতায় তিনি কাব্যের যে সহজ ও সবল রূপ সংগ্রহ করেছিলেন, সেইটেই তাঁর দান। মনে মনে তিনি যন্ত্রসভ্যতা চান নি, গসপ্লানে তাঁর ফিরে চলার নিষ্ক্রিয় স্বপ্ন ভেঙে যায়। এই জনপ্রিয় কবি মদ্যপ হয়ে ওঠেন, ইসাডোরা ডানকানকে বিয়ে করেও দুর্দান্ত কুসঙ্গে শক্তিক্ষয় করে' শেষটা আত্মহত্যা করেন। এই দুই কবির কথা স্মরণীয় এই জন্য যে পলায়নের মতোই উন্মত্ত উৎসাহের মূলেও রোমান্টিক ভ্রান্তি। বিএড্নিও এর কবলে পড়েন। তাই উশাকভ্, সেভ্টলভ্, টিখোনভ্ ইত্যাদি নেতি ছেড়ে আশ্বাস খোঁজেন সৃষ্টিতে, নির্মাণে, সমাজতান্ত্রিক রিয়লিজ্মের আশ্রয়ে। এ বিষয়ে বহু আলোচনার মধ্যে গোর্কির লেখকসভার মহৎ গভীর বক্তৃতায় মূল্যবান্ কথাগুলি পাঠ্য। রচনাটি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। গোর্কির উৎকৃষ্ট সমালোচনা ছাড়া বুখারিনের প্রবন্ধটিও এই সভার একটি দান। এরেন্বুর্গ, লিওনভ্, রাডেকও এই আলোচনায় যোগ দেন। অবশ্য রাশিয়ায় ভুল স্বীকার, ও সংশোধন সমধিক প্রচলিত, বরং তা এতো দ্রুত হয় যে অনেক অলস ব্যক্তিই উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়। আন্দোলনযুগের ত্রুটিসংশোধনে Rapp গঠিত হল। আবার Rapp-এর কর্তৃত্ব দেখা গেল শিল্পসাহিত্যে অবান্তর ও ভ্রান্ত। এখন তার পরিবর্তে Central Art Committee ও তার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নভিন্ন শিল্পের সঙ্ঘের স্বাধীন কিন্তু সমবেত কাজ। অবশ্য এই সব ছেয়ে আছে জনসাধারণ। অদ্ভুত ও প্রবল তাদের তাগাদা। ঐ লেখকসভাতেই ডন্ অঞ্চলের কয়লাশ্রমিক, পূর্ব সাইবিরিয়ার পায়োনিঅর, মস্কৌ কারখানার শ্রমিক, সৈন্যদল, নাবিক, শিশুর দল ইত্যাদি দলে দলে তাদের উৎসাহ, তাগাদা ও দাবী জানিয়ে যায়।

এরা সবাই চায় আরো বই, আরো ছবি, আরো বিষয়বস্তুর প্রসার, বর্তমান প্রাত্যহিক নবজীবনের জটিল রূপ শিল্পের মননে সুসংবদ্ধ, সহজ ও আবেগবোধ্য

দেখতে। এইখানেই socialist realism-এর উৎস। জীবনের তথ্য বিষয়বস্তুর মহিমায় লেখকগণ ভাবিত, অন্যদেশে যেমন লেখকরা বিষয়ের সন্ধানে দিশাহারা। নূতন সভ্যতার উৎসাহে তাই মহাকাব্যজাতের উপন্যাসই আদর্শ। কৃষিসমবায় সাহিত্যবিষয় হল শোলোকভে। গ্লাড্‌কভের প্রেরণা কারখানায়। সুদূর এসিয়ার সভ্যতাপত্তন, চীন-জাপান সংঘর্ষ, সিয়ামে জাপান ইত্যাদি হল পাভ্‌লেঙ্কোর Red Planes Fly East-এর বিষয়। বিপ্লব ও অন্তর্যুদ্ধের মধ্যেও অনেকে বস্তু পেলেন—ফুর্‌মানভের চাপাএভ্, ইভানভের The Armoured Train। গোর্কির ঈগর্ বুলিচেফ্ ও ডস্‌টিগাএফ্ নামে নাটকের বিষয়েও এই ঐতিহাসিক মনোযোগ মনস্তত্ত্বে মিশেছে—১৯১৭-র মার্চ থেকে নভেম্বর অবধি এর কাল। অত্যন্ত বিবেকী লেখকরা এতে উৎসাহী; ফরাসী বিশ্লেষণে এঁরা অনেকেই সিদ্ধহস্ত—টলস্টয়, লিওনভ্, প্যারিস্‌বাসী এরেন্‌বুর্গ, শাগিনিয়ান, এঁরা যে কোনো সাহিত্যের গৌরব। ট্রেটিয়াকভের biointerview ডেন্-শী-শুআ-র বিশ্লেষণে চীনের তরুণ মন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাটকেও এই সুকুমার মনস্তত্ত্ব বিপ্লবে সার্থক হয়েছে—ভিশ্‌নেভ্‌স্কির An Optimistic Tragedy, পোগোডিনের The Aristocrats, আফিনো-জেনেইভের "ভয়," The Distant Point, অকালমৃত ওস্‌ট্রভ্‌স্কির নাটকগুলি। সমালোচনা ও নিজেদের হাস্যরসের প্রচুর নমুনা মেলে উপন্যাসে নাটকে—Six Soviet Plays-এর Squaring the Circle-এ বা Another Man's Child-এ কম্যুনিজ্‌ম নিয়ে ঠাট্টা উপাদেয়। পিল্‌নিয়াক ইত্যাদি এ রকম গল্পও লিখেছেন যাতে বোঝা যায় যে গোর্কি-নিন্দিত leaderism সত্যই এখানে ভূত হয়ে চাপে নি। জানি, কেউ হয়তো ধাঁ করে বাবেলের নাম বা পাস্টেরনাকের নাম করবেন, বলবেন কর্তৃপক্ষের চাপে এঁরা এতো কম লেখেন। মজা হচ্ছে বাবেল নিজে হেসে এর জবাব দিয়েছিলেন যে তিনি মধ্যে মধ্যে মৌনতার শিল্পচর্চা করতে চান। এরেন্‌বুর্গ এ বিষয়ে আলোচনায় বেশ বলেন যে তিনি নিজে বেশি লেখেন,

তবে কেউ কেউ, যেমন বাবেল্, যদি কমই লেখেন তো সেই নিয়ে উত্তেজনা বৃথা, কারণ এটা শুধু স্বভাবের কথা। তিনি নিজে খরগোসের মতো, মুহুর্মুহু তাঁর বাচ্ছা হয়, আর বাবেল হাতীর মতো, দীর্ঘ তাঁর লেখনীর গর্ভযন্ত্রণা।

কিন্তু য়ুনিয়নের সাহিত্যের বিস্তার বিষয়ে এ সামান্য প্রবন্ধে কিছু আভাস দেওয়া যায় না। সব কটি দেশে সব কটি ভাষায় এর বিস্তার। এমন দেশও এই সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার পূর্ণ প্রসাদ পেয়েছে যেখানে আগে বর্ণমালাও ছিল না। আজ তাই রাশিয়া ছাড়া য়ুনিয়নের সর্বত্র সত্তরটি ভাষা সমৃদ্ধি পাচ্ছে। য়ুক্রাইনে মিকিটেঙ্কো, শ্বেতরাশিয়ায় অশীতিপর শিরভান্ ঝাডে বহু ভাষায় অনূদিত, আর্মেনিয়া জর্জিয়াও মাথা তুলেছে। আর্মেনিযার প্রবীণ কবি আকো-পিয়ানের অনুবাদ পাস্টেরনাক ও বিয়েড্নি করেছেন। জর্জিয়ার কবিদের মধ্যে টাবিড্জে চিকোভানি ও শাল্ভা ডাডিআনির নাম শোনা যায়। সব চেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছেন উজ্বেকিস্থানের মহাকবি আবদুল্লা কাদিরি। 'প্রগতি' নামক পুস্তকে এঁর অনুবাদ বেরিয়েছিল। তাজিক কবি সাত্রেদ্দিন আইনি ও হাশেম লাহুটিও উল্লেখযোগ্য। কির্গিজ্স্তানে ক'বছর আগে বর্ণমালাই ছিল না, এখন সেখানে বহু বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, লাইব্রেরী, কাগজ ও রেডিওর সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও চলে এবং আলি টোকোম্বাএভ্ সেদেশের মহাকবি। লাখুটির নামও সারা য়ুনিয়নে মান্য। এই ইরানী কবি য়ুনিয়নকেই মাতৃভূমি বলে' বরণ করেন।

শুধু সংখ্যা ও প্রসার নয়, সার বা গভীরতার দিকে য়ুনিয়নে নজর সমধিক। অবশ্য প্রসারও আশ্চর্য। গোর্কির বই কুড়ি বছরে শুধু রাশিয়ানেই ৩ কোটি ৩০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। তরুণ লেখক শোলোকভের বই ক'বছরে ৩০ লক্ষ কপি কাটতি। শোলোকভের বছরে কাটতি ৫ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ, টলস্টয়ের ৩ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ। পুশ্কিনের কাব্যগ্রন্থ ৩৫ ও ৩৬ সালে ১,৭৫,০০,০০০ কপি বিক্রি হয়। বিদেশী লেখকের বইও চলে খুব। গয়টে, শেক্সপিঅর, স্কট, ডিকেন্স্, বালজাক্, ফ্লোবেয়র্, দ' মোপাসাঁ ও হাইনের চল্ বিস্ময়কর।

সরকারী প্রকাশকেরাও পাঠকের তাগিদ রাখতে পারে না, ফয়খ্‌ট্‌বাঙেরের উপন্যাসের চাহিদা হয়েছিল ১ লক্ষের উপর, কিন্তু ছাপা হল মাত্র ৬০০০০। রোলাঁর কোলা ব্রুঞওঁ-র ক'বছরে ১২০টি সংস্করণ বার করতে হল। ড্রাইসার, ডস্‌ পাসস্‌, হেমিংওএ, কন্‌রাড, গল্‌সওআর্দি, ওএল্‌স্‌, টমাস্‌ মান্‌, জিদ্‌, বার্‌বুসেরও দারুণ বিক্রি।

একটা কারণ অবশ্য লাইব্রেরির বিস্তার। সব রকম ধরে ৩৬ সালে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ১৩৫৮৪৭। তার মধ্যে ১৫০০০ লাইব্রেরির পুস্তকসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি করে'। এই বিস্তার অবশ্য ব্যাপক। যথারীতি অর্কেস্ট্রা ও গানের দল ছাড়া সখের গানের দলই ৩৬ সালে তিরিশ হাজার এবং অর্কেস্ট্রা পঁচিশ হাজারে উঠেছিল। সরকারী অর্থ সাহায্যেই শুধু এর ব্যাখ্যা হয় না। থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদির সংখ্যাই ছিল চুয়াল্লিশ হাজার।

চল্লিশটি ভাষা বিপ্লবের পরে প্রথম ছাপাখানার মুখই দেখল। এই যে সংস্কৃতিপ্রসার প্রাচ্যের আদিম জাতিদেরও দ্রুত সভ্যতায় নিয়ে এল, তা আমাদের কল্পনা করাও কঠিন। জাতীয় জীবন যে একতায় অখণ্ডতা পেয়েছে, সেই অবৈকল্য সংস্কৃতির জগতেও, শিক্ষা ও সৃষ্টির মধ্যে আর বিরোধ নেই। সর্বত্র শিক্ষার ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থার পিছনে যে ব্যাপক চিন্তা, সহযোগ ও অর্থ তার পরিচয় এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু একটা প্রভেদ দ্রষ্টব্য। অন্যদেশে শিল্পসাহিত্যে যা কিছু সৃষ্টিকার্য, যা কিছু সৎ তা কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে যেতে বাধ্য—সরকারী বা সামাজিক প্রতিপত্তির বিপক্ষে। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়ে' দাঁড়ায় সংস্কৃতির ছদ্মবেশী শত্রু ও মাস্টাররা লজ্জাকর রসিকতা মাত্র। কিন্তু সোভিয়েট য়ুনিঅনে সরকার স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভক্ত। শিক্ষায়তনও তেম্‌নি আর্টের সহায়। শুধু আর্টিস্টদের সাহায্য করতে বা ভাবী আর্টিস্টকে গড়ে' তুলতে নয়, পাঠক দর্শক শ্রোতা তৈরী করতে, সমালোচক তৈরী করতে। কারণ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি শুধু দর্শনে বা কলকারখানায় নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সার্থক।

তাই জ্ঞানের ও বিশেষজ্ঞের এতো মর্যাদা, শিক্ষার এতো সম্মান। জ্ঞানের সম্মান খুঁটিনাটিতেও দেখা যায়। কিরশোন্ বিমানব্যাপার নিয়ে নাটক লেখেন, নামজাদা বিমানবিহারীরা তার নাটক শুনে, দু'একটা তথ্য বলে' দিলে, কির্শোন্ লেখা বদ্লালেন। শিশুশিক্ষা থেকে শিল্পসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে কি করে সভ্যতার হাতেখড়ি হয় তা একটা বিরাট ও জটিল ব্যাপার। তারপরে তো বরাবরই ছবি ও গান, সাহিত্য ও নাট্যশালা ও সিনেমা আছেই। মার্শাক্ ও চুভস্কির আলোচনায় বোঝা যায় কি পরিশ্রমে ও কি স্নচিন্তায় শিশুদের জন্য শ্রেষ্ঠ আর্টের প্রয়োগ। তাদের ক্লাব, থিয়েটার, সিনেমা, পত্রিকা ও প্রকাশক ব্যবস্থাও আলাদা। নাটালিয়া সাট্সের কাহিনীটি প্রসঙ্গত মার্জনীয়। একদা ১৮ সালে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেই ভীষণ দুরবস্থাতেই যখন সোভিয়েট গঠনকার্যে তৎপর, মস্কৌ সোভিয়েটে একটি পঞ্চদশী এসে হাজির। কি ব্যাপার? না, সে শিশু থিয়েটার করবে এবং তার একটা ভালো বাড়ী চাই। ডিরেক্টর কে? মেয়েটি বললে, আমি, আর কে? অনেকেই হাসলেন কিন্তু কের্দ্জেন্জেভ্ হলেন উৎসুক। হল থিয়েটার। অন্তত ৪০ লক্ষ বালকবালিকা আজ সাট্সের ভক্ত। Kerdzenżev আজ C.A.C-র সভাপতি। সাট্সের প্রভাব আজ দেশব্যাপী এবং তার মন্ত্র হচ্ছেঃ Children must be shown great art.

শিল্পীর বয়স্ক পরিণতিতেও এতে অনেক স্নবিধা। ভাবী নটনটী শিশুপ্রতিভার লীলাতেই বিকাশ পায়। অবশ্য বয়স্ক নাট্যশালাতেও বিস্তৃত ও গভীর শিক্ষা দেওয়া হয়—যেমন অন্য সব শিল্প ব্যাপারেও স্থপতি, লেখক, চিত্রকর, ভাস্কর, সঙ্গীতকার, কারুকার সকলেরই অবাধ শিক্ষাস্নযোগ। দীর্ঘ ও ক্রমিক সিলেবস-রচনায় বিশেষ জ্ঞানের পরিচয়। তাছাড়া শিক্ষাকালে অর্থের চিন্তা ও পরে বেকার সমস্যা নেই। শিক্ষার সময়েই অর্থলাভ সম্ভব। শিক্ষায়তন থেকে বেরিয়ে সঙ্গে

যোগদান করাই রেওয়াজ। মস্কৌতে ধরুন ১৬০০ স্থপতি, ১২০০ স্থপতি-সঙ্ঘের সভ্য, তাঁরা সবাই ৪০০০ থেকে ৫০০০ রুব্‌ল মাইনে পান, অধিকন্তু নকসা গৃহীত হলে কমিশন।

অন্যদেশের সমাজব্যবস্থায় সব শিল্পীই অল্পবিস্তর নিজের উপর নির্ভর, তাতে অনেকটা শক্তি দুশ্চিন্তায় বা সম্মার্জনে নষ্ট হয়। তাছাড়া নেতিমূলক আত্মরক্ষায় একটা কাঠিন্য আসে। ওরই মধ্যে তবু লেখক কিছু শিল্পসাধনা করতে সক্ষম, কিন্তু নাট্য বা স্থাপত্য পরমুখাপেক্ষী অনেক বেশি। সোভিয়েট নাট্য বা স্থাপত্যের উৎকর্ষ ও প্রসার তাই স্বাভাবিক। নাট্যে স্টানিস্‌লাভ্‌স্কি, নেমিরোভডান্‌চেঙ্কো প্রাচীন উৎকর্ষের স্থায়ী উদাহরণ; তেমনি তরুণ ওখলপ্‌কভ্, টাইরোভ বা মায়ারহোল্‌ড, ভাখতাগোনভের শিল্পের উৎকর্ষ ও নানা পরীক্ষার সুযোগ অন্যত্র দুর্লভ। এবং এঁদের নাটকনির্বাচন পৃথিবীব্যাপী, সোফোক্লিস্‌ থেকে শেক্‌সপিঅর্, রবীন্দ্রনাথ, ও'নীল যে প্রযোজনা রাশিয়ায় পেয়েছেন, তার তুলনা নেই। থিয়েটারের এই সর্বব্যাপী উন্নতির সঙ্গে রাশিয়ার ফিলমআর্টের উৎকর্ষ মনে রাখা ভালো। অনেক ডিরেক্টরই আজ জগদ্বিখ্যাত—আইজেনষ্টাইন, পুডোভ্‌কিন, ডভ্‌শেঙ্কো, চাওউরেলি, জিগান, এম্‌লের, ভাসিলিএভ সিনেমা ও সমাজকে অভূতপূর্ব উৎকর্ষের মধ্যে বেঁধেছেন। এখানে বলা যায় যে য়ুনিয়নখ্যাত Peter the First ছবিটি কলকাতায় এসেছিল। এই ডিরেক্টারদের একজন অন্তত অন্যহিসাবে পরিচিত—আলেক্‌সাণ্ডার রমের শিল্পসমালোচনা "মাতিস্‌" মাতিসের উপর একটি অত্যন্ত ভালো বই বটেই, সম্ভবত ফ্রাই যে গোলকধাঁধায় আমাদের ঘোরান, তা থেকে মুক্ত বলে' শ্রেষ্ঠ বইই।

থিয়েটারের মতো সিনেমাও য়ুনিয়নে সবদেশে ছড়ানো। স্থাপত্যেও তাই ভিন্ন দেশে জলহাওয়া, পারিপার্শ্বিক, লোকের অভ্যাস অনুসারে স্থপতিদের কাজ করতে হয়। কালিনিন একবার বলেন:

Our peoble say to the architect, "Plan us an underground, remember that people will have to travel on this underground to and fro from work; think how to make the journey as little fatiguing as possible."

স্থাপত্য তাই এখানে যেখানে সেখানে যেমন তেমন একটি সুন্দর বাড়ী করে শেষ নয়। গ্রোপিউস্ বা ল্যকোরবুসিএর ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা এখানে নেই, আবার স্থাপত্যের সমস্যাও এখানে আরো জটিল। বাড়ী নয়, পাড়া, সারা রাস্তা হবে একটা সমগ্র একক। তাছাড়া যাদের জন্য, তারা কি চায় তাও ভিতরে দেখতে হবে, যাতে আনাগোনার পথ সোজাসুজি হয়, সময় ও শ্রম বাঁচে। সচরাচর রাশিয়ায় বাড়ীঘর পাঁচ ছ তলার হচ্ছে—ধরা যাক্ মস্কৌ শ্রমিক-ক্লাবের ছবিগুলি—তাতে আছে স্টুডিও, থিয়েটার, জিম্‌নাসিঅম, লাইব্রেরি, নর্সারি, একাধিক হল, ক্লাসঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি। সংস্কৃতিপ্রাসাদগুলিও এইরকম জটিল। বিল্ডিং কোঅপরেটিভ্ বাড়ী তো একটি সম্পূর্ণ গ্রামই মস্কৌর মধ্যে, সরকারী সাহায্যে সঙ্ঘের রচনা। সম্পূর্ণ নগররচনাও সোভিয়েট্ স্থাপত্যের প্রচলিত কাজ, মাগ্‌নিটোগোর্স্ক, ডিনিএপেট্রভ্স্ক্, বোল্‌শোয় জাপোরজিএ, মেরুদেশে ইগরেকা, আভ্‌রোষ্ট্রয় ইত্যাদি প্লান্ করা সহর। কোলখোজেও স্থাপত্য-শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। সুদূর—আমাদের নিকট—স্টালিনাবাদ, আশ্‌খাবাদ্, আল্‌মা-আটা-রও চেহারা আধুনিক রুচিতে স্বাস্থ্যকর সুবিধাকর হয়ে উঠেছে। সব হয়তো সমান শিল্পে উৎকর্ষলাভ করে না, কিন্তু প্রাভ্‌দার বাড়ী, সোচি সানাটোরিয়া, রেভ্‌স্কোভস্কি অগুর্গ্রোণ্ড স্টেশন, খারকভের House of Projects ইত্যাদির ছবি উন্নাসিকেরও তৃপ্তিকর।

অবশ্য স্থাপত্য তথা চিত্রশিল্পের সম্বন্ধে কিছু জানা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। তবু বই কিছু ইংরেজিতে পাওয়া যায়। তবে যখন জানা যায় যে ১৯৩৬-এ

২৪০ জন চিত্রকর, ৮০ জন গ্রাফিক্ শিল্পী ও ৬০ জন ভাস্কর শিল্পীসঙ্ঘের চুক্তিতে প্রায় ৩০ লক্ষ রুব্‌ল্ পান বা ১৯৩৭ সালে কর্তৃপক্ষ ৬ লক্ষ রুবল খরচ করেন শুধু ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীতে, তখন শিল্পের মর্যাদা বোঝা যায়। বলাই বাহুল্য, শুধু দেশীয় শিল্পে নয়, প্রাচীন ও আধুনিক সব শিল্পীর সম্মান, হার্মিটেজ, ট্রেটিয়াকভ্ ওএস্টর্ণ আর্ট গ্যালারি পশ্চিম য়ুরোপের চিত্রশালা হিসাবে একান্ত মূল্যবান। ইসোগিজ প্রকাশিত পুস্তকে এদের শিল্পসম্ভার আন্দাজ করা যায়। এই শিল্পচর্চার সুফল সোভিয়েট চিত্রেও পাওয়া যায়। কোরিনের গোর্কি, ব্রড্স্কির মিলে-ধাঁজের ছবি, লেবেডেভার সুকুমার ডেকরেটিভ চিত্রাবলী একাডেমিক ঐতিহ্যেরই বিকাশ। গোগ্যাঁর বর্ণবিলাস পেট্রভ্‌ভডকিনের বা কুজনেটসভে সার্থক, যেমন সার্থক আর্মেনিয়ার সারিয়ানের স্বদেশচিত্র মাতিসের বর্ণাঢ্যতায়। সোভিয়েটে সুবিধা হচ্ছে, শিল্পীদের দূরদেশে পালিয়ে' সৌখীন exotic চিত্র আঁকতে হয় না, নতুন জীবনের উল্লাস, নানা প্রদেশের নানারকম দৃশ্যপটে ও জীবনযাত্রায় চিত্রকরের জীবন্ত উপলক্ষ্য জোটে। এখনও অবশ্য ইম্প্রেশনিষ্ট বর্ণতারল্য চল্‌তি, পিমেনভের ধারালো ব্যঞ্জনাতে তার আভাস। প্যারিস্ বা লণ্ডন যেমন মোনে, পিসারো, হুইস্‌লার প্রভৃতির ছবিতে লোকের চোখে লাগ্‌ল, সোভিয়েট য়ুনিয়নে তেমনি শিল্পের ম্যাজিকে সহর গ্রাম ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছে। মস্কোর মেট্রোরেলপথ, চেলিউস্‌কিন, মালিগুইন্ ক্রাশিনের মেরুদেশ, কলকারখানা, প্রাচ্যের চাইখানা ইত্যাদি সব ছবির বিষয়। পোর্ট্রেট চল্‌তি খুব, জেরাসিমভের, কাট্‌জ্‌মানের, সামোখভালভের চরিত্রদৃষ্টি প্রশংসনীয়। জর্জিয়া য়ুক্রাইনে ও অন্যান্য অঞ্চলে চিত্রকলা বর্ধিষ্ণু। পোস্টার চিত্রের কুক্রিনিক্‌সি-নামে শিল্পী তিনজনের নাম বিখ্যাত। ক্রাভ্‌চেঙ্কো বা ফাভর্স্কিও উল্লেখযোগ্য চিত্রকর। মানের সার্থকতা যেমন পিমেনভে, দেগার যেমন জেরাসিমভে, তেমনি আধুনিক পশ্চিমের শিল্পকাঠিন্য বিপ্লবী বিষয়ে আবেগবান্ প্রাণবন্ত হয়েছে ডাইনেকার চিত্রে।

ভাস্কর্যে শোনা যায় সোভিয়েট শিল্প এখনও তেমন প্রতিভার পরিচয় দেয়

নি। তবু কোরোলেভের প্রতিমূর্তিগুলি, লেবেদেভার সুকুমার মূর্তি নগণ্য নয়। মের্কুরভ বা নেরোডার স্টালিনও শক্তিশালী নিদর্শন। দিমিত্রি চালাপিন্‌ বা ইভানভের বিস্ময়কর শক্তিও তুচ্ছ নয়। এঁরা অনেকেই সোশ্যালিস্ট সমাজের সন্তান, সামান্য শ্রমিক থেকে শক্তিবলে শিল্পীর শিক্ষাসুযোগ অর্জন করেছেন। তাই আশা হয় এই জীবনে যাঁরা monumental কীর্তি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শিল্পেও তাঁরা সেই আধুনিক শিল্পের কাম্য monumentality প্রকাশ করবেন। তার বহু আভাস এরই মধ্যে শিল্পসাহিত্যের রচনাতে পাওয়া গেছে, তাই দেশবিদেশের শিল্পীরা সোভিএটে সম্মান ও মনোযোগ পান। রোলাঁ, মালরো, ব্লক, ড্রাইসার, আণ্ডেরসেন্‌-নেক্সোয়ে প্রভৃতি তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মেলান। বর্ণার্ড্‌ শ-ও তাই মস্কৌতে এক সভায় বলেন :

> We know that there have been many civilisations, that their history has been very like the history of our civilisation, and that when they arrived at the point which Western capitalistic civilisation has reached, there began a rapid degeneracy, followed by complete collapse of the entire system and something very near to a return to savagery by the human race.···
>
> Now Lenin organised the method of getting round that corner. If his experiment is pushed through to the end, if the other countries follow his example and follow his teaching······we shall have a new era in history...

And that is what Lenin means to us. If the future is the future as Lenin foresaw it, then we may all smile and look forward to the future without fear. But if the experiment is over-thrown and fails, if the world persists on its capitalistic lines, then I shall have to take a very melancholy farewell of you, my friends.

I shall bid you farewell in any case, because I have already spoken quite enough.

জনসাধারণের রুচি

"যাকে এক ভঙ্গীতে আকস্মিক বা এলোমেলো ঘটনা মনে হয়, আরেক দিক থেকে তাই স্ট্যাটিস্টিকাল্ বা সংখ্যাবিজ্ঞানের নিয়মে প্রকাশিত। নিউটনীয় বিজ্ঞানের স্বয়ম্ভবতা ও স্বাধীনতার অতিমাত্রা এখন সমষ্টিজীবযৌথ ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় রূপান্তরিত।......যুদ্ধের আগে থেকেই উদারনীতিক ভাববাদীর বিজ্ঞানের চিত্র কল্পনাবিলাসে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীন বৈজ্ঞানিক প্রায় লুপ্ত জীববিশেষ।"

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ একবার নিখিল ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞান সম্মেলনে বলেছিলেন যে বিজ্ঞানের সত্য যেমন একহিসাবে সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যে সমীকৃত তত্ব, তেমনি সংখ্যাবিজ্ঞানের তথ্যপ্রমাণ রসদ জোগায় আধুনিক মানুষের উন্নতির পরিকল্পনায়। ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানাগার এরই মধ্যে, ১৯৩৫-৬ থেকে ১৯৪২-৪ অবধি প্রায় ১১৫৯ তথ্যানুসন্ধান এবং নানাবিধ বড়ো সুমাবের কাজ করেছে। দেশের লোকের মধ্যে এ কাজের গুরুত্ববোধ কেন এত কম জানি না। বিজ্ঞানাগার অবশ্যই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান নয়, ফলে তার আত্মসম্মান প্রচারকার্যের উঞ্ছবৃত্তিতে শেষ হয় না। কিন্তু আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় নৈরাশ্য কমবে আর বৈজ্ঞানিক মনোভাব বৃদ্ধি পাবে এবং সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্য আমরা নানাদিকে গ্রহণ করতে পারব। তত্ব ও তথ্য, জীবন ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই এ বিজ্ঞানের কাজ, প্রত্যক্ষের সমস্যায় এখানে রাশি-প্রত্যয়ের কূটচর্চা হয়। বলা বাহুল্য, আমরা বিজ্ঞানের অর্থ বিদ্যালয়ের নিরালম্ব মৃত ও নিরাপদ জ্ঞান বুঝি না।

জে, ডি, ব্যর্ণলের ভাষায় বহুকাল হল বিজ্ঞানের সীমা প্রসারিত। বিজ্ঞান এখন হয়েছে উৎপাদন-যন্ত্রের ও কৃষির একাত্ম অংশ। স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণে এর হাত, ব্যবসায় ব্যাঙ্কে আপিসে সরকারী কাজেও বিজ্ঞানের নির্দেশ। বিজ্ঞানের বিধিব্যবস্থাগুলি আর মনোনীত ভাবগুলিই একালের চিন্তা ও কর্মধারার রূপ নির্ণয় করে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানাগারের অনুসন্ধান ও সুমারির যে তালিকা পাওয়া যায়, তাতে এই ব্যবহারিক সার্থকতা স্পষ্ট হবে, ১৯৪১এ অনুসন্ধানের মধ্যে কৃষিসমস্যা ৮১, নৃতত্ব ৩, অর্থশাস্ত্র ৩০, শিক্ষা ১৭, বন ৭, যন্ত্রশিল্প ১১, গণিত ১২, স্বাস্থ্য ২০, আবহতত্ব ও জলসেচন ১৪ এবং অন্যান্য বিষয় ২০টি ছিল।

শুধু ব্যবহারিক সার্থকতা ধরলে নিঃসন্দেহ অন্যায় করা হবে। মহলানবিশের সমীকৃত বিস্তার নিছক বৈজ্ঞানিক অবদান, নমুনা-সুমারের পদ্ধতির বিকাশও বিজ্ঞানজগতে কল্‌কাতার দান। আজকে শুধু জনসাধারণের রুচিসন্ধানে যে তিনটি সুমারি হয়েছিল, সাহিত্যের সামাজিক ঝোঁকে তার বিশেষ দাম বলে' সে বিষয়ে সামান্য কিছু আলাপ করা যাক।

২

প্রথমত, এ রকম কাজ যখন জড় প্রকৃতিতে সন্ধান হয়, তখন যেমন নিছক বৈজ্ঞানিক তথ্যই সন্ধানীর উপজীব্য হয়, তেমনি ব্যক্তি বা মানুষের সমাজঘটিত সন্ধানে একটি মূল্যস্বীকার আরম্ভেই করণীয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৯৪১ সালে Modern Review-তে জনরুচি বিষয়ে প্রবন্ধে এই পুরুষার্থ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছেন। ব্রাইসের মতো সকলকেই মানতে হয় যে অতি দীর্ঘ কাল থেকে স্বীকার বা অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে মানবসমাজ জনসাধারণের অধিকার কিছুতেই ভুলতে পারে নি। পারেনি বলেই তাকে গ্রীসে দাসপ্রথা গড়তে হয়েছে, ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমের বিস্মৃতিকৌশল তৈরি

করতে হয়েছে। কালস্রোতে ভেসে যায় সবই, শুধু থাকে জনসাধারণ, মৃত্যুহীন নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিসমষ্টি।

এ কথা স্বীকারের পরে জনসাধারণের সাধারণ্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি হবে না। এবং এই আর্যসত্যের উপরে সংখ্যাবিজ্ঞানের নমুনা-সুমারের ভিত্তি। দশহাজারের ভিড়ে তাই দুশো লোকের মন্তব্য শুনলেই রিপোর্ট যথাযথ লেখা সম্ভব। কথা উঠবে সাংবাদিকের দলীয় দৃষ্টি যাবে কোথা? আর, ঐ দুশো লোক হয়তো হবে এককোণে ভিড় করে' বসে' একটি দল। প্রতিকার সহজ। প্রথম কথা, একজন সাংবাদিকের একপেশে মন্তব্য এখানে মানছি না, মানছি বিশজনের ভিন্ন দৃষ্টি, পরস্পরকে কাটাকুটি করে' যেটা একটা ভারসাম্য পায়। তাছাড়া আছে সতর্ক হিসাবের ছক, যাতে একই জিজ্ঞাসায় বিশ জন লোক বিশটি এলাকায় বা আলাদা ভাবে চল্লিশটি এলাকায় ঘুরবে। স্বেচ্ছায় নয়, অতিসতর্ক ছকের নির্দিষ্ট এলোমেলো হিসাবে। কথাটা উঠবে ঐখানে, এলোমেলো কি হিসাবে প্রতিনিধি? কাপড়ের নমুনা যে হিসাবে,এক চুপ্‌ড়ি আমের উপরে নিচে এ পাশে ও পাশে যে কোনো পাঁচটা যে হিসাবে। পক্ষপাত-সম্ভাবনা দূর করবার জন্যই এলোমেলো বাছাই।

১৯৪১-এ জনরুচি সুমারে তিনটি ভাগ করা হয়েছিল—

(ক) থ্যাকারের রাস্তার নির্ঘণ্ট থেকে কল্‌কাতায় খাপছাড়াভাবে বাছাই করা হয় ১৫০৩ টি পরিবার বিস্তৃত প্রশ্নমালার উত্তরের জন্য।

(খ) অল্‌-ইণ্ডিয়া-রেডিওর সাহায্যে ৮৩০ জন রেডিও লাইসেন্সী ধরা যায় একনম্বর সাধারণ সুমারের এলাকা থেকেই। তাতে ফলাফলের তুলনা করা সম্ভব হয়েছিল।

(গ) হ্যারিসন ও ম্যাজ্‌ প্রবর্তিত বিলেতি ম্যাস অবসার্ভেশন্‌ ধরণে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও আলাপের মধ্যে 'দয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল মুখ্যত মিত্রশক্তি, নিরপেক্ষ (১৯৪১ সালে নিরপেক্ষের সংখ্যা কিছু ছিল, সুইডেন তুর্কী ও স্পেন ছাড়াও, যারা বোধহয় আগামী বৎসরে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করবে)

এবং অক্ষশক্তির বেতার-বার্তা বিষয়ে। এতে কল্‌কাতায় ৩৮৬ জন লোক পরীক্ষা করা হয় এবং জগদ্দলে ১০১ জন। দ্বিতীয় সুমারে কল্‌কাতা ছাড়া জগদ্দল এবং আসানসোলেও গণনা হয়েছিল।

৩

সংস্থানের দিকে, কল্‌কাতায় সমস্ত ক্ষেত্রটি ছটি ভূগোল-এলাকায় বা মহলে ভাগ করা হয় এবং খবর আনেন প্রতি মহল থেকে তিনটি ভিন্ন সন্ধানী দল। ফলে একই মহল থেকে তিনটি স্বাধীন তথ্যের ত্রিবেণী পাওয়া যায় এবং সমস্ত ক্ষেত্রটাতে তাই খানিকটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ফলাফল সংগ্রহ করা যায়।

একচল্লিশের ২৩শে মার্চ রেডিও লাইসেন্সের ফর্দ লেবরেটরিতে পৌঁছায়। দু' সপ্তাহ কাটে নমুনার পদ্ধতিটা ঠিক করতে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিবারগুলি আর লাইসেন্সীদের বাছাই, এবং ক্ষেত্রকার্যের ছক তৈরি করতে। ১৬ই এপ্রিল তথ্যসংগ্রহ আরম্ভ ও ছয় সপ্তাহে শেষ হয়। ফেব্রুয়ারি মার্চে ছোট-খাটো সংগ্রহের পরীক্ষা করে দেখা হয় পূরোসময়ের কর্মী দিয়ে। তারপরে চেষ্টা করা হয় বাইরের স্বেচ্ছাকর্মীর সাহায্য নেবার। দুটোর কোনটাই সুবিধা না হওয়ায় কাজ ও অর্থব্যয় বিবেচনার পর শেষে লেবরেটরির কর্মীদেরই খণ্ড-কর্মী হিসাবে প্রয়োগ করা স্থির হয়। বিবেচনা করেই কর্মীর সংখ্যা বেশি করা হয়েছিল: কল্‌কাতায় জন পঞ্চাশেক, জগদ্দলে ৫ জন, আসানসোলে ৪ জন। সংখ্যাধিক্যের একটা সুবিধা হচ্ছে তথ্যসংগ্রাহকদের ব্যক্তিগত মতামতের পক্ষপাত এতে পরস্পরকে নাকচ করে। তাছাড়া বেশি লোকের কাজটা জানা হয়ে থাকে, যাতে করে ভবিষ্যতে যোগ্যতরদের বেছে নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নতালিকার উত্তর সংগ্রাহকেরা লিখেছেন পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীকে

জিজ্ঞাসা করে। এই উত্তরই ব্যবহার করা হয়েছে যদিচ একই পরিবারে ইচ্ছুক অন্য ব্যক্তিদেরও উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে পারিবারিক তুলনা এ কাজের বাইরে। ইতিমধ্যে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে জনতানিরীক্ষার কর্মী বাছাই করা হয় সাধারণ বুদ্ধি ও শিক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা, বিবেচনা ও সামাজিকতা ইত্যাদির দিক থেকে। এ কাজ কলকাতায় করেন আংশিকসময়ের কর্মী ২২ জন, জগদ্দলে পূরোসময়ের একজন। মে-র শেষ সপ্তাহে ও জুনের প্রথমে এ নিরীক্ষা সমাধা হয়।

তখনকার বড়ো খবর ছিল রুডল্‌ফ্‌ হেসের ইংলণ্ডে অবতরণ এবং জর্মানির সঙ্গে ভিশি-র বশ্যতাব্যবস্থা। বল্কান্‌ অঞ্চলে তখন জর্মান জয়যাত্রা। স্বদেশে তখনো সাতটি প্রদেশে লাটের শাসন চলছিল এবং কংগ্রেসের দাবিদাওয়া মেটেনি। তারপরে যুগোশ্লাভিয়ার পতন, আফ্রিকায় মিত্রশক্তির সাফল্য, ইরাকে গোলমাল ও তৈলনলপথের ইংরেজি অধিকার, ষ্টালিনকে প্রধান মন্ত্রীপদে আরোপ, ক্রীটের যুদ্ধ, এবং এ পক্ষে হুড্‌ ও পক্ষে বিস্‌মার্ক জাহাজ ডুবি। পাট আর আকের পোকার দুটি বিপুল সুমারির মধ্যে লেবরেটারীর কর্মীদের এ কাজ করতে হয়েছিল, সে হিসাবে কাজটা খুবই দ্রুত বল্‌তে হয়।

মোটামুটি, নমুনাগুলি মধ্যবিত্তশ্রেণীতেই আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, কারণ বেশীর ভাগ কর্মীই শুধু এই শ্রেণীর পরিচয় রাখতেন। তাছাড়া এই শ্রেণীই জিজ্ঞাসার প্রধান বিষয়। খবর নেওয়া হয়েছিল নিম্নোক্ত বিষয়েঃ মেয়ে কি পুরুষ; বয়স; অবিবাহিত, বিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা; ধর্ম; মাতৃভাষা; শিক্ষা; জীবিকা বা কাজ; এবং আর্থিক অবস্থা,—শেষেরটি রোজগার কতো এ অপ্রতিভ প্রশ্নের বদলে মাসিক সংসার খরচার হিসাব। রেডিও রিপোর্টে প্রশান্তবাবু বিশেষ করে' লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা এবং জীবিকার কি প্রভাব পছন্দ-অপছন্দ নির্দিষ্ট করে, সে বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন। অক্ষশক্তি মিত্রশক্তি ও নিরপেক্ষ শক্তির যুদ্ধের বেতারসংবাদে রুচিভেদ আলোচনায় ধর্ম, ভাষা এবং প্রদেশও বিচার্য।

৪

রিপোর্ট থেকে সামান্য কিছু তথ্য-আলোচনা হয়তো পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি করবেনা।

প্রথমে রেডিও ও দৈনিক সংবাদ ধরা যাক্। কল্‌কাতায় সংবাদে অনুরাগ দেখা গেল পুরুষের মধ্যে শতকরা ৯১, মেয়েদের মধ্যে ৮৬। রেডিও থেকে সংবাদ পান পুরুষ শতকরা ৩৫, মেয়ে ৪৪। খবরের কাগজ থেকে সংবাদ পান পুরুষ শতকরা ৬০, মেয়ে ৩৯। আর্থিক হিসাব এখানেও খাটে। ৪০ টাকা মাস খরচার দলে রেডিও সংবাদ শোনেন শতকরা ১৭ এবং ৪০০ টাকার উপরের ভদ্রলোকেরা শতকরা ৪১। খবরের কাগজে খবর চান পুরুষ ৭১, মেয়ে ৩৫। সব সুদ্ধ রেডিও শোনেন মেয়ে শতকরা ৩৬.৪ এবং পুরুষ মোটে ১৯.৬। তেমনি আবার কখনও রেডিও শোনেন না, এমন মেয়ে শতকরা ৩৬.৪ আর পুরুষ ১৯'৪। মেয়েদের গার্হস্থ্যই অবশ্য এ দুয়ের কারণ। এখানে বলা ভালো যে সাধারণ রুচিসুমারের প্রশ্নমালার একটি হচ্ছে রেডিও নিজের ঘরে, পথে বা দোকান কোথায় শোনেন। মোহনবাগান ঈষ্টবেঙ্গল খেলার খবর শ্রবণরত ভিড় পথে ঘাটে দোকানের সামনে সন্ধ্যাবেলার সাধারণ দৃশ্য। বলাই বাহুল্য, কম মেয়েই বাড়ীতে রেডিও না থাকলে বাড়ীর বাইরে গিয়ে রেডিও শোনেন। আর গল্পগুজব থেকে সংবাদ পান শতকরা ১৯.৪ অন্তঃপুরিকা, ম্যাট্রিকপূর্ব ১২.২, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শতকরা ২০.৫ এবং চল্লিশ টাকার তলায় ১৮.৪। বয়সের সঙ্গে রেডিও-সংবাদে আবেদন কমে, শোনায় ও চাহিদায় দুয়েই, যেমন বৃদ্ধি পায় আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে।

৫

এবারে রেডিও ও আমোদপ্রমোদ ধরা যাক্। রেডিও, সিনেমা, গ্রামোফোন এই তিন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। রেডিওর কপালে পুরুষ শতকরা

৪৬'৭ এবং মেয়ে ৫১'১ পাওয়া গেল, প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সিনেমায় যাতায়াত আছে এবং গ্রামোফোনের শ্রোতা মাত্র শতকরা ১৭'৮। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও-র প্রমোদশক্তি এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছেনা; হচ্ছে চাকুরিয়া গৃহস্থের সকাল-সন্ধ্যা খানিকটা গার্হস্থ্য-জড়িত, খানিকটা বিশ্রামঘটিত অভ্যাস। এ হিসাবে রেডিও-র আরো চল্‌তি হওয়া উচিৎ। না হওয়ার বড়ো কারণ ভারতীয় দারিদ্র্য এবং আরেকটা কারণ নিশ্চয়ই য়ুরোপীয় অর্থে, একটি দম্পতির সাংসারিক সম্পূর্ণতা আমাদের দেশে এই সবে আসছে। এখনও ভারতবর্ষে ব্যক্তির স্বয়ম্ভবতা জাতীয় অভ্যাসে দাঁড়ায় নি, এদিকে যেমন আমাদের Public জীবন ব্যক্তিগত, তেমনি অন্যদিকে Private জীবন পুরানো পঞ্চায়েৎ আর একান্নবর্তিতার জেরে আত্মীয় কুটুম্বের প্রতাপে প্রায় প্রকাশ্য বললেই হয়।

সেইজন্যই কি গৃহকর্তার কর্তৃত্বের সুযোগে রেডিওর ব্যবহার বয়সের সঙ্গে বেড়ে চলে? কারণ টেব্‌লে মাননির্ঘণ্টে দেখা যায় যে শিক্ষার তারতম্যে এখানে প্রায় কিছুই আসে যায় না। সিনেমার প্রায় সমান চল্‌তি সব শ্রেণীতে। গ্রামোফোনের দুর্গতিতে দুঃখ লাগ্‌লেও অবাক্ হই নি। গৃহস্থের স্বাধীন উপভোগ বর্তমান লেখক ও তার অনেক বন্ধুদের কাছে গ্রামোফোনেই সম্ভব, পছন্দ-সই ভালো রেকর্ড বাজারে পাওয়া যায় প্রচুর, শুদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীত আর তার চেয়ে অনেক বেশি য়ুরোপীয় সঙ্গীতের। কিন্তু এখানে দেখা যায় মনিহারী দোকানদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-জগতে গ্রামোফোনের সব চেয়ে খাতির— শতকরা ২৬।

আবার যদি শোনা আর শুন্‌তে চাওয়ার তুলনা ধরা যায় তাহলে দেখা যায় বয়স, শিক্ষা অর্থ বা কর্মস্থান নির্বিশেষে আরো বেশি সিনেমা যাবার এবং কম গ্রামোফোন ব্যবহারের বাসনা সুলভ। অভ্যাস নয়, পছন্দের দিক থেকে সিনেমা রেডিওর চেয়ে জনপ্রিয় বলা যায়।

৬

রেডিওর নমুনা-সুমারের বিষয়ে কিছু বলা দরকার। সে সময়ের রেডিও আর্টিষ্টদের পুরো তালিকা দেওয়া হয় প্রশ্নপত্রের এক পিঠে, অন্য পিঠে নানা দফায় প্রশ্ন ছিল। যথা, রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত, বক্তৃতা, ওস্তাদী সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি। "প্রায়ই" শোনেন কি "মধ্যে মধ্যে" শোনেন, "কদাচিৎ" বা "কখনো নয়"। তাছাড়া দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল "আরো বেশি" না "আরো কম" শুনতে চান। প্রশান্ত বাবু ১৮ দফায় প্রশ্নগুলির বিচার করেছেন। সংক্ষেপে

যুদ্ধের খবর	শতকরা	৭৭· ৯
নন্তব্য	"	৭৪· ৪
আধুনিক সঙ্গীত	"	৭৮· ৪
রবীন্দ্র "	"	৭৪· ৪
যন্ত্র "	"	৭৩· ৪
নাটক	"	৬৮· ৮
ধর্ম সঙ্গীত	"	৬৬· ৩
ওস্তাদী-সঙ্গীত	"	৪৫· ১-ব্যক্তি শোনেন।

অবশ্য এর মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। ভিন্ন লোকের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব, যেমন সম্ভব দিনক্ষণের প্রভাব। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় সব সময়ে সব দফা থাকে না, তাতে শোনার সুবিধা অসুবিধা নিশ্চয়ই কমে বাড়ে। নাটক যদি দুপুরে দেওয়া হত, তাহলে শতকরা ৬৮·৮ গৃহস্থেরা ঘুম বাদ দিয়ে আর চাকুরিয়ারা অফিস কামাই করে, কল্‌কাতা বেতারের বিখ্যাত নাটক বা সঙ্গীতের ইতিহাসে কল্‌কাতার কিম্ভূত সৃষ্টি "আধুনিক ভাবগীতি" শুনতেন কিনা সন্দেহ। গ্রাম্য সঙ্গীত, শিশু ও মহিলা আসর, সঙ্গীত শিক্ষা আর গ্রামার্থে অনুষ্ঠানগুলি যে

কল্‌কাতায় এত অপ্রিয়, তার মধ্যেও নিশ্চয় এ দুই কারণ বর্তমান। বোঝা শক্ত সঙ্গীতশিক্ষা কার উদ্দেশ্যে? তাছাড়া আমাদের নমুনায় শিশু, মহিলা ও গ্রাম্যজন কমই ছিল। তবে রেডিও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা, থেকে থেকে রেডিও অফিসে রাজ-বংশের পরিবর্তন, বা তাঁদের বন্ধুবৎসলতা এ সবই নমুনা-স্থমারের বাইরের ব্যাপার। তথ্যসংগ্রহে ঔচিত্যের পক্ষপাত নেই।

তাছাড়া অর্থের নানা দিক ধর্তব্য। বয়সের তারতম্যে রুচির পরিবর্তন লক্ষণীয়। আধুনিক সঙ্গীত শতকরা ৭০·৮ থেকে পঞ্চাশোর্ধ্বে ১২·২-তে পরিণত হয়, রবীন্দ্র সঙ্গীত ৬৬·৬ থেকে ২১·২। কিন্তু ভক্তির দাম বয়সে বাড়ে, ধর্মসঙ্গীত ২৫·০ থেকে ৫১·৫-তে ওঠে। ওস্তাদী গান আঠারো বছরের কনিষ্ঠদের মধ্যে শ্রোতা পায় শতকরা ১৬·৭, উনিশ থেকে পঁচিশ বছরের যৌবনে পায় ২৯·৯ এবং পঁয়ত্রিশের পরে মধ্য বয়সে নেমে যায় ১২·১-এ। যাকে রেডিও স্টেশনে তাঁরা হাস্যকৌতুক বলেন, সে দফা শতধারা ক্লিওপেট্রার মতোই বয়সে শুকোয় না। শিক্ষার সঙ্গে স্বভাবতই বক্তৃতাগুলির আদর বাড়ে। আধুনিক সঙ্গীত রবীন্দ্র সঙ্গীত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমাজে যথাক্রমে বেশি ও কম এবং বৃত্তিজীবী সমাজে কম ও বেশি, চলে। মেয়েরা যে এতো বেশি ঘরে বসে সাপ্তাহিক নাটক শোনেন, তার কারণ অবশ্য বাংলা-ভাষায় রেডিও নাট্যের বিকাশ নয়।

৭

রিপোর্টে যথার্থই বলা হয়েছে, আমাদের দেশে নৈরাশ্য এত গভীর যে অনেকেই কম বেশি চাহিদার দফায় নিরুৎসাহ। সবই যেন কল্‌কাতা কর্পোরেশন নির্বাচন প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এই ভোট না দেওয়ার ব্যাপারেও বৈশিষ্ট্য আছে। অর্ধেকের বেশি লোক সংবাদ ও মন্তব্য বিষয়ে চাহিদার

কম বেশি জানিয়েছেন, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি আলাপ বিষয়ে মতামত দিয়েছেন, শতকরা ৭০-এর বেশি লোকের রেডিওর শিশু, মহিলা আর গ্রাম্যজন অনুষ্ঠান বিষয়ে কোনো উৎসাহ নেই। আবার আধুনিক ভাবগীতি ও রবীন্দ্র সঙ্গীত ভোট পেয়েছে শতকরা ৫০-এর বেশি লোকের কাছে। ভোট গণনায় যথাক্রমে দেখা যায় চাহিদা বেশি আধুনিক গীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, নাটক, যুদ্ধের খবর, এবং ধর্ম সঙ্গীতের। ওস্তাদী গানের সময় গড়পড়তায় দেখা যায় লোকে আরো কমাতে চায়। প্রসঙ্গত, মেয়েরা পুরুষের চেয়ে মহিলা অনুষ্ঠান, আধুনিক ও রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং নাটকের ভক্ত। আর তাঁরা খবর বক্তৃতা এসব বিশেষ পছন্দ করেন না। বয়স, শিক্ষা ও পেশা অনুসারে এই সব চাহিদার নানা রকম তারতম্য ঘটে। পঞ্চাশোধ্বে যেমন ভক্তিমার্গে মন যায়, ম্যাট্রিক্ পাস করার পরে তেম্‌নি যুদ্ধসংবাদ ও মন্তব্য, বিদেশী সংবাদ, বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের দাবি বৃদ্ধি পায়। ঐ সব দফায় দেখি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর অনুরাগ নেই, তাঁদের উৎসাহ নাটকে ও ধর্ম সঙ্গীতে। বৃত্তিজীবীরা তার বিপরীত। ছাত্রেরা প্রায় সব দফাতে ক্ষুধার্ত। এবং এই চাওয়ার ক্ষমতায় ভূসম্পত্তিবানেরা ছাত্রের পরেই। ওস্তাদী গানের একমাত্র ভক্ত কিন্তু ভূসম্পত্তিবানদেরই বলা যায়, ওস্তাদী ঐতিহ্যের অবশেষ ও সময়ের প্রাচুর্য তাঁদের হাতে বলেই সন্দেহ নেই। গায়কের যে দায়িত্ব রূপায়নে বা ইণ্টারপ্রিটেশনে, সে দোভাষী দায়িত্বও বলা বাহুল্য ওস্তাদী গানে বেশি, যেমন বেশি রবীন্দ্র সঙ্গীতে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সৌকুমার্য গায়কগায়িকা সমাজে সুলভ, কিন্তু কণ্ঠশক্তির সাধনা ও ব্যক্তিত্বের আবেগ রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরও রূপায়নে একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু, কবির ব্যক্তিস্বরূপের প্রবল পটভূমিতেই সার্থক তাঁর গানের সুকুমার ব্যঞ্জনা।

৮

আঠারো দফার মধ্যে পাঁচটি সবচেয়ে বেশি পছন্দসই দফা কি, এ প্রশ্নের গড়পতা উত্তরে প্রথম স্থান হল আধুনিক গীতি নামক দফার, শতকরা ৫০·৬। রবীন্দ্র সঙ্গীত ৪২·৮, নাটক ৩৯·৪, যন্ত্রসঙ্গীত ৩৯·২, ধর্ম সঙ্গীত ৩১·১, যুদ্ধের খবর ৩২·০ এবং বাকিগুলি পরীক্ষায় বিকল বললেই হয়।

একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে শোনা এবং চাহিদার মধ্যে প্রভেদ। যুদ্ধ সংবাদ শোনেন অনেকে, কিন্তু শ্রবণেচ্ছুক সংখ্যায় কম। সঙ্গীত শিক্ষার দফাতেও তাই। এ দুটি ঠিক সময়হরণার্থে প্রমোদও নয়। ওদিকে, নানাবিধ সঙ্গীত ও নাটকের বেলায় শোনার চেয়ে চাহিদা বেশি—হয়তো এগুলিকে আরো শ্রাব্য আর আরো সুবিধাকর সময়ে করা যেতে পারে ভেবে। রবীন্দ্র সঙ্গীত চাহিদার প্রমাণে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কিন্তু শোনার কপাল গুণে ষষ্ঠ। এর কারণ কি শিল্পী নির্বাচন আর রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাগে অতি অল্প সময় বিতরণ? প্রশ্নপত্রগুলি ঘাঁটলে মনে হয় শিল্পীর ব্যক্তিত্ব শিল্প দফার মহিমা বা মহিমার অভাব অনেক সময়ে নির্দিষ্ট করে। গ্রাম্যসঙ্গীতে নিরুৎসাহ কল্‌কাতাবাসিনী তাই দেখি আব্বাস-উদ্দীনকে নম্বর দেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাধারাণী প্রভৃতি শিল্পীবিষয়েও পক্ষপাত দ্রষ্টব্য।

৯

রেডিও-র দাম ও মেক্‌ মিলিয়ে দেখলে হয়তো ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেশনের বেতার স্পষ্টতার উত্তরটি বেতারযন্ত্রকর্তার কাজে লাগতে পারে। দশটি বিদেশী, দশটি ভারতীয় বেতার কেন্দ্র বিষয়ে চারটি জিজ্ঞাসা ছিল : ভালো শোনা যায় কি চলন

সই শোনা যায়, অস্পষ্ট না একেবারে শোনা যায় না। কলকাতার স্থমারে স্বভাবতই স্থানীয় কেন্দ্র প্রথম হয়েছিল—শতকরা ৯০। দিল্লী শতকরা ৪১। তারপরে একবারে সমুদ্র পারে যেতে হয়, তৃতীয় স্থান বি-বি-সি-র। চতুর্থ বোম্বাই। বিদেশী ফর্দে লণ্ডনের পরে আসে বেলির্ন, টোকিও, চুং কিং। ইণ্ডোচায়না শতকরা ১৬.২, ফ্রান্স ১৩.০, সোভিয়েট য়ুনিঅন ১২.৫, তুর্কীর শ্রোতা কল্‌কাতায় শতকরা ৮.৪।

এরপরে আমার সংক্ষিপ্তসারে অক্ষ, মিত্র ও নিরপেক্ষ শক্তির যুদ্ধ সংবাদ ও মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আসা যাক্। এ সন্ধানে অনেকেই জবাব দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নি। তবু কল্‌কাতায় শতকরা ৬০ আর জগদ্দলে শতকরা ৬৭ জনের মতামত পাওয়া যায়। প্রশ্ন ছিল তিনটি পক্ষের বিষয়ে মন্তব্য চেয়ে—ইনটরেষ্টিং, বিশ্বাস্য এবং প্রপাগাণ্ডা হিসাবে সার্থক কি-না।

মনে রাখবেন সময়টা ১৯৪১। কাজেই বেশী লোকের কাছে যে শত্রুর বেতার ঘোষণা মনোজ্ঞ বিশ্বাস্য, তাতে আশ্চর্য কি? অনেকের পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আর্থিক প্রাদেশিক ও ভাগ ফলটা। রেওয়াজ যে বাংলাদেশেই জার্মান প্রীতি সমধিক ছিল নিম্ন এবং মধ্যবিত্তে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার উপরতলায় বেশি আস্থা ছিল বটে নিরপেক্ষ বেতারবার্তায়, তবে মাসিক চারশো টাকার উপরে গেলে ফ্যাসিষ্ট ক্ষমতা, সত্যবাদিতায় ভক্তি বেড়ে ওঠে। আবার বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে মিত্রপক্ষ ও নিরপেক্ষ বেতারে আস্থা বর্ধমান। যুক্তিযুক্তভাবে বৃত্তিভোগী বা পেশাজীবীরা নিরপেক্ষ সংবাদে নির্ভর করেন; তারপর মিত্রশক্তির আত্মপ্রচারে। যে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা বিনাকর্মে কালাতিপাত করেন, তাঁরা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বহুবিধ বাঁধা চাকুরিয়া নিছক মিত্রশক্তির অনুরাগী। মেয়েদের কৌতূহল কিন্তু নাৎসি আবেদনে। মুসলমান নমুনা সংখ্যায় সামান্য হলেও, প্রতিনিধিমূলক বলা যায়। মুসলমান প্রতিক্রিয়া শত্রু বেতারের পক্ষেই গিয়াছিল। তেম্‌নি অবাঙালীর সংখ্যা স্থমারে তথা কল্‌কাতাতে কম হলেও মতামতের তারতম্য বিস্ময়কর। হিন্দি, উর্দু ও মারাঠি ভাষীরা দেখা যায় বাংলাভাষীর চেয়ে

বেশিরকম অক্ষশক্তিকে বিচক্ষণ ভাবেন। প্রাদেশিক ভাগে এই সংক্ষিপ্ত টেব্‌ল্‌টি পাঠকের কৌতূহল জাগাতে পারে :

	মনোজ্ঞ			বিশ্বাস্য			সার্থক প্রচার		
	শত্রু	মিত্র	নিরপেক্ষ	শত্রু	মিত্র	নিরঃ	শত্রু	মিত্র	নিরঃ
আসাম	১০০	০'০	০'০	১০০	০'০	০'০	৫০	০'০	০'০
বাংলা	৫৪'৮	২৮'০	১৭'২	৫৪'৯	১৮'৯	২৬'২	৬১'০	২৮'৫	১০'৫
বিহার	৯৩'৩	৬৭	০'০	৮৬'৭	১৩'৩	০'০	৯২'৯	৭'১	০'০
বোম্বাই	৬০'০	২০'০	২০-০	৫৫'৬	৩৩'৩	১১'১	৮৮'৯	১'১	০'০
মধ্যপ্রদেশ	৬৬'৭	৩৩'৩	০'০	১০০'০	০'০	০'০	১০০'০	০'০	০'০
মান্দ্রাজ	০'০	১০০'০	০'০	০'০	০'০	০'০	০'০	০'০	০'০
পাঞ্জাব	১০০'০	০'০	০'০	৬৬'৭	০'০	৩৩'৩	১০০'০	০'০	০'০
ত্রিবাঙ্কুর	৭৫'০	০'০	২৫'০	৫০'০	৫০'০	০'০	৭৫'০	২৫'০	০'০
যুক্তপ্রদেশ	৭৬'২	১৪'৩	৯'৫	৬৩'৬	১৩'৬	২২'৭	৭৬'২	১৯'০	৪'৮

সাধারণ ভাবে বলা যায় যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া মোটামুটি বেশীর ভাগ মতই অক্ষশক্তির বেতারবার্তার পক্ষে যাচ্ছে—বা ১৯৪১ এ-যাচ্ছিল।

বহু কাজ এখনো করা যায় শুধু এই রেডিও স্থমার নিয়েই। তাছাড়া জনরুচির সাধারণ স্থমারে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান মিল্‌বে। ইংরেজী লেখক স্থচী, বাংলা লেখক স্থচী, ইংরেজী ও বাংলা ফিল্‌ম্‌ স্থচী মিলিয়ে বেশ সামাজিক মানস ও সংস্কৃতির ছক পাওয়া যায়। যিনি এড্‌গার ওয়ালেসের ভক্ত তিনি কি দীনেন্দ্রকুমার রায়েরই ভক্ত না অনুরূপা দেবীর ও বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরও? এমিল্‌ জোলা, মারি আঁতোয়ানেৎ ও কিং কং ফিল্‌ম্‌ কি করে' একই সঙ্গে প্রিয় হয়? বা ষ্টিভ্‌ন্‌ স্পেণ্ডর ও এড্‌গার ওয়ালেস্‌? আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের কৌতূহলও জাগতে পারে যেমন—বুদ্ধদেব বসু ও সজনী-কান্ত দাসের পরিচিতি এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সমর সেনের আপেক্ষিক

পাঠকের অভাব। তাছাড়া বিধবা বিবাহ, বিপত্নীক বিবাহ, স্বগোত্র বিবাহ ইত্যাদি বিবাহ বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনার বস্তু আছে। আরেক জিজ্ঞাস্য হচ্ছে বোম্বাই-এর কংগ্রেস ঐক্য বিষয়ে, এবং জাপানের ও আমেরিকান যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনার বিষয়। খেলাধূলা, রোজকার পাঠ্য খবরের কাগজের নাম, বিদ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষা বিষয়ে মতামত—চা কফি ইত্যাদি নেশা, এলোপ্যাথাদি চিকিৎসাপদ্ধতির পক্ষপাত। সাধারণ সুমারের একটি ভাগ হচ্ছে কোষ্ঠী-বিচার ও কর-বিচার ঃ বিশ্বাস অছে কিনা, নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে মিলেছে কিনা প্রভৃতি প্রশ্ন। এর সঙ্গে লেবরটরি থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র যে সন্ধান হয়েছিল, দুটী মিলিয়ে অসহায় বাঙালীর অতিপ্রাকৃতে আস্থার উপরে মূল্যবান একটি বই লেখা যায়। ১৯৪১-এ নমুনাসুমারে দেখা গিয়েছিল যে কল্‌কাতার মধ্যবিত্ত সমাজে দুইতৃতীয়াংশ লোকের ঠিকুজী আছে এবং একতৃতীয়াংশের আছে গণনায় বিশ্বাস। ১৯৪২-এ এক শিশুসদনে ৩০০ শিশুর জন্ম ও অকাল-মৃত্যু জ্যোতিষ গণনার সঙ্গে মেলানো হয়েছিল।

উপরের সামান্য আভাসেও বোঝা যাবে আমাদের জীবনের নানা সমস্যায় সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যের মূল্য কতখানি। বিংশ শতাব্দীর মানুষের সমস্যা অভূতপূর্ব্বভাবে বিরাট ও জটিল, তার সমাধানও কঠিন ও সমষ্টি-সাধ্য। তবু—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কথাতেই শেষ করি ঃ

কোনো সমাধান যে হতে পারে সে শুধু বিজ্ঞানের বৃত্তি ও বিজ্ঞানের নানাপদ্ধতির বিকাশের জন্যেই সম্ভব। বিশ্বব্যাপী মানুষের পুনর্গঠনের বীজ এরই মধ্যে সেখানে রোপিত। আমরা আজ প্রয়োজনীয় যা কিছু দ্রব্য সবই তৈরী করতে পারি, বিতরণের ব্যবস্থাও আমাদের আয়ত্তে, বিতরণের জন্য দেশে দেশে যোগাযোগ নির্মাণ আজ সম্ভব। আর তার চেয়ে মূল্যবান্ হচ্ছে বিজ্ঞানের আহরিত সেই জ্ঞান, যাতে আমরা অনুসন্ধান করতে পারি, পরিমান করতে পারি একটা মানব সমাজের পরিবর্তনশীল নানা প্রয়োজনের মতো বিরাট ও জটিল তথ্য।

হাল্‌কা-কবিতা *

কোনো কোনো যুগে সাহিত্য উচ্ছল হ'য়ে' ওঠে প্রাচুর্যে, কোনো যুগে বা হয় ক্ষীণকায়। বিষয়বস্তু বা লিখনরীতি সব যুগে একরকম হয় না, কখনো কাব্য হয় অনায়াস, কখনো বা দুর্বোধ্য কঠিন। অডেনের মতে এ সবের কারণ খুঁজতে হবে কবিদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছেড়ে অন্যত্র।

কারণ কালাতীত কারয়িত্রীপ্রতিভাই শুধু সর্বযুগের কবিদের সাধারণ সম্পদ। ভাষামার্গ, কথ্য ও লেখ্যভাষার প্রতি পক্ষপাত, প্রত্যক্ষপ্রয়োগ, শ্রোতাদের গুণাগুণ ইত্যাদি সবই পরিবর্তনশীল রুচির গতিবিধি। কবির মুক্তি অবশ্য সত্যভাষণেই, বন্ধুবান্ধবকে আনন্দদানেই। কিন্তু সে সত্যের রূপ আর সে বন্ধুদের কুলশীলনির্ণয়ের ভার সমাজের এবং অংশত হয়তো কবির জীবনযাত্রার উপরে। যখন কবির প্রত্যক্ষপ্রজ্ঞার জগৎ সমাজচৈতন্যের অখণ্ডতায় মোটামুটি পাঠকের জগতে সাযুজ্য লাভ ক'রে, তখন কবি বহুর এক হয়, তার ভাষা হয় সরল, মুখের ভাষার পাশ ঘেঁষা, রুচির প্রগতি হয় বাঁধাসাধা। ছিন্নভিন্ন সমাজে কবি হ'য়ে' ওঠে কবিবিশেষ, তার ভাষা হয় বিশেষজ্ঞের, তাকে অস্থির হ'য়ে' বেড়াতে হয় চৌষট্টি সতীর্থে। অডেনের মতে প্রথম অবস্থায় লাইট্‌ বা অনায়াসবা লঘু কবিতার সম্ভাবনা। এই কাব্যশরীরে অনায়াস কবিতা মর্মে মর্মে জীবনবেদে গভীর হ'তে পারে। লঘু কবিতা বল্‌তে অনেকে যে ভাঁড়ামি বা ইয়ারকি বা সামাজিক পদ্য বোঝেন, তার কারণ রোমান্টিক উজ্জীবনের পরে সমাজবিপ্লবের ফলে কবি ও পাঠক এতই বিচ্ছিন্ন যে কবিদের গম্ভীর আত্মস্থতা থেকে ছুটি নিলে শুধু এই খেলো হাসিতে, নাগরিক আলাপের মৌখিকতায় বা ঠুন্‌কো ব্যঙ্গেই নাম্‌তে হ'ত।

---

* (The Oxford Book of Light Verse : Chosen by W. H. Auden.)

কিন্তু চিরকাল এম্‌নি ছিল না। এলিজাবিথান্ যুগ পর্যন্ত প্রায় সব কবিতাই অনায়াস ছিল। ধর্মের ঐক্যে, জগচ্চিত্রের একতায়, জীবনযাত্রার রীতি-পরিবর্তন যতদিন ক্রমিক মন্থর ছিল, ততদিন কবি-পাঠক ছিল সমগোত্র। ইলিজাবেথের সময় থেকে নটরাজের পদক্ষেপ হল দ্রুত এবং সম্ভব হল সেক্স-পিঅরের কিছু কিছু, এবং ডন্, মিল্‌টন্ প্রভৃতির কঠিন কাব্য। দুর্বোধ্যতা সর্বদাই নিন্দনীয় নয়। কারণ লঘিমাসিদ্ধি যতই লোভনীয় হোক্, একথাও সত্য যে, সমাজচৈতন্যের একতার জন্যই লঘু কাব্য ক্রমে হয়ে' দাঁড়ায় মামুলি রক্ষণশীল সমাজের আত্মপ্রীতির আওতায় সংকেতিত বা অভ্যাসিক। আপন-কালে গতানুগতিক কৃতার্থে কবি তখন চিরকালের মানবিক পুরুষার্থকে দেয় বিসর্জন। তাই সমাজ যতই অস্থির হয়, কবি যতই সমাজ থেকে দূরে ছিট্‌কে পড়ে, তার দৃষ্টি ততই স্বচ্ছ হয়। কিন্তু সেই পরিমাণেই তার প্রকাশ হয় দুরূহ। কদাচিৎ এমন যুগও থাকে যখন এই দুয়ের দোটানায একটা প্রচণ্ড ভারসাম্য আসে এবং এলিজাবিথান্ যুগের এই সৌভাগ্য হয়েছিল এবং হয়তো আজকাল সেরকম যুগের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

সপ্তদশ শতকে দেখি ধর্মের মতো কাব্যেও উৎকেন্দ্রিক লীলা চল্‌ছে। স্পেন্‌সর্‌কে বাদ দিলে মিল্‌টনকেই বলা যায় প্রথম আত্মসর্বস্ব উন্মার্গ কবি। এই ছন্নছাড়া ভাব হর্বার্ট্, ক্র্যাশ প্রভৃতির কাব্যে, ব্রাউনের গদ্যেও দ্রষ্টব্য। এক মার্ভেলেই কিছু এবং হেরিকেই ঐতিহ্যের প্রভাব বর্তমান।

রেস্টোরেশনে আবার সমাজ দানা বাঁধল—যদিচ শুধু সমাজের উপরতলায়, উজ্জীবিতরাজ্যের আশে পাশে। কবির মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ড্রাইডেন্ এবং পোপ্ তাই অবলীলায় কবিতা লিখলেন। সীমাবদ্ধ তাঁদের কবিতা, তাঁদের পাঠকসমাজের মতোই। কিন্তু সেই গণ্ডীর ভিতরে তাঁদের বিচরণ কমবেশি স্থিতধী, স্বচ্ছন্দ।

তারপরে রোমান্টিকদের পালা—যান্ত্রিক বিপ্লবে ছত্রভঙ্গ, অস্থির। গ্রাম হল গৌণ, সমাজ হল সহুরে, বিবাহে সম্পর্ক স্থাপন না করলে বা কর্মক্ষেত্রে

সহকর্মী না হলে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ রাখা দুরূহ হয়ে' উঠ্‌ল। শ্রেণিবিভাগ হয়ে উঠ্‌ল বহুধা আর আরো ধারালো। চাকুরিয়া বা জমিদারদের দায়িত্ব ঘাড়ে না পেতেই হল এক নতুন শ্রেণী—ডিভিডেণ্ডজীবীর দল। যেন জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা বা লালগোলা বা শোভাবাজারে আর কবিদের আসন পড়ল না, পাঠক হয়ে' দাঁড়াল অপরিচিত মিশ্র এক জনসাধারণ নামে নির্বিশেষ প্রত্যাহার। লিরিকল্‌ ব্যালাড্‌সের প্রস্তাবে এর আলোচনা পঠিতব্য। ফলে কবিরা সমাজের দেয়ালে মাথা ঠোকা ছেড়ে মন দিলে আত্মচর্চায়, অথর্ববেদ ছেড়ে বেদান্তে। ফলে ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ পোপের চেয়েও সৌখীনমার্গে লিখলেন তাঁর স্তবগুলি, আত্মজীবনীর নাম দিলেন—এক কবির মনের বিকাশ। রোমাণ্টিকেরা সবাই ছুটলেন ঘরকে করতে বাহির, কেউ নিসর্গে, কেউ স্বর্ণভবিষ্যতে, কেউ অতীতের মায়াকাননে, কেউবা নিরালম্ব কাব্যের সাত্বিক তপোবনে।

কবির কাজের চেহারাও গেল বদ্‌লে, কবিতা হল গৌণকথকের অরণ্যে-রোদন। ব্যক্তিগত জগতে কিছুকাল চলল ঘোরা ফেরা, আবিষ্কার ও আত্ম-জ্ঞানের সীমা এসে মিশল মনোবিশ্লেষণে। নব্যসমাজতন্ত্রের বামাচারীই আজ ভরসা। কারণ ডিভিডেণ্ডজীবীদের ভবিষ্যৎও আজ শ্রমিকদের উদ্যত বাহুতে নির্দিষ্ট।

কিন্তু এর মধ্যেও লঘুকাব্য জন্মেছে। চাষাসমাজের বর্নস্‌ আর বনেদি বায়রন্‌ দুজনেই স্কচ্‌। কিন্তু বর্নসের সমাজে চল্‌তি ছিল বহু একতার ধারা—ধর্মে, লোকাচারে, লোকসঙ্গীতে। ফলে বর্নসের বিহার ব্যাপক, কান্নাহাসির জগৎ তাঁর প্রত্যক্ষ ও কৈবল্যে অভিন্ন। কিন্তু বায়রনকে হয় শুধুই গর্জন বা মজা করতে। কাব্যের অন্তরঙ্গ গাম্ভীর্য বা কবিত্ব তাঁর নেই কারণ স্মার্ট সমাজে সে বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাই প্রীডও প্রাঅরের চেয়ে অসার।

তারপরে উনিশশতকে দেখা যায় গ্রামসম্পর্ক ছিঁড়ে যাওয়ায় জ্ঞাতিকুটুম্বহীন ব্যক্তিদের একমাত্র নিরাপদ ও প্রকাশ্য সম্বন্ধ দাঁড়ায় পিতামাতা ও শিশুর সম্বন্ধ। সেই ভিত্তিতে গড়ে' উঠল শিশুসাহিত্য ও ননসেন্স-কাব্য। অবশ্য লোকসাহিত্য

চিরকালই রয়েছে, কিন্তু সমাজের ঘুণ তাতেও ধরেছে। তাই সেকালে যে ট্রাজিক্ মাহাত্ম্য বর্ডর্-ব্যালাডেও পাওয়া যেত, তা একালের গানঘরের পালাগানে দুর্লভ। তাই এখন মনঃসম্পন্ন অনায়াস কাব্য লিখতে গেলে গা ভাসাতে হয় কোনো প্রবল শ্রেণিস্বার্থের নির্দিষ্ট স্রোতে। কিপলিং মধ্যবিত্তের সাম্রাজ্যবাদে ডুবে তাই করেছিলেন। এবং বেলক্ ও চেষ্টরটন্ রোমান্ ক্যাথলিক্।

আজকে তাই কবিকেও নিজের গরজে ভাবতে হয় ভাবী সমাজের প্রয়োজন, যেখানে অন্যায় সুযোগের পক্ষপাতে জাত ভেদবুদ্ধি থাকবে না। সচেষ্ট চৈতন্যেই তার সম্ভাবনা, নচেৎ আজকে তার অধঃপতন। সেই সমাজের একতানির্দিষ্ট স্বাধীনতাতেই সম্ভব বয়স্ক বুদ্ধিসম্পন্ন অথচ অনায়াসবোধ্য বা লঘু কাব্য। এবম্বিধ মুখবন্ধ যাঁদের অভিরুচি মতো নয়, তাঁদেরও কিন্তু চয়নিকাটি ভালো লাগ্‌বে তার বহুবিধ কবিতার সন্নিবেশে। অনেক কবিতা নতুনও লাগ্‌তে পারে—দি মেজর ও মাইনর প্লেসর্‌স্ অব লাইফ্, দি উইক্ এণ্ড্ বুক, দি বুক অব্ লাইট্ ভর্স্ সত্ত্বেও। বইটি আরম্ভ দি সং অব্ লিউইস্ দিয়ে—

Richard, that thou be ever trichard,
tricchen thou shalt be nevermore.

সব শেষ করে' স্কেলটন্—

By Saynt Mary, my lady,
Your mammy and your daddy
Brought forth a godely baby !

ডনবরের কবির লড়াই বা flyting কবিতাটিও বর্তমান। মধ্যে অজস্র নামকরা, কম নামকরা কবির কবিতা ও বহু নামহীন কবিতা ও গান শেষ করে এসে পড়া যায় বেলক্ চেষ্টরটন্ প্রভৃতিতে। সওয়া পাঁচশ পৃষ্ঠার চয়নিকার প্রতি সুবিচার উদ্ধৃতিতে সম্ভব নয়, যার বৈচিত্র্যের মধ্যে লিডেল এবং স্কটের গ্রীক অভিধান শেষ করার উপলক্ষে হার্ডির মজার কবিতা নির্বিবাদে খাপ খেয়ে যায় লিঅর্ বা ক্যারলের সঙ্গে বা অনামী কবির এই উপদেশের সঙ্গেও—

Then to each gay flighty wife may this a warning be,
Don't write to any other man or sit upon his knee ;
When once you start like Mrs. Maybrick perhaps you
couldn't stop,
So stick close to your husband and keep clear of
Berry's drop.

অথবা এডম্‌ণ্ড ক্লেরিহিউ বেণ্ট্‌লি-র :

What I like about Clive
Is that he is no longer alive,
There is a great deal to be said
For being dead.

গদ্যকবিতা *

চিরাচরিত কাব্যে অভ্যস্ত আমাদের পক্ষে নতুন কোনো কাব্যরূপ ভাবনার বিষয় হয়ে ওঠে। শ্রেণিবিভাগের সহজ চেষ্টায় তখন কাব্যপাঠ হয়ে' ওঠে বিড়ম্বনা। বিশেষ করে বাংলা গদ্য কবিতার প্রথম সাক্ষাতে। কারণ ইংরেজি গদ্য আর পদ্যের চেয়েও বাংলা গদ্য আর পদ্যের মধ্যে বিরোধ বেশি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠ এবং আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ তুলনা করলে এই লজ্জাকর সত্য বুঝি। অথচ গদ্য ও পদ্য শত্রু নয়, সে কথা বুঝতে সংস্কৃত অলঙ্কার বা এরিষ্টটলের কাছে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এবং গদ্য ও পদ্যের এই আপাতবৈষম্য দূর করতে যিনি পুরোধা, সে মহাকবির কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই আমাদের অভ্যাস।

সাধারণ জীবনে যদি সাহিত্যের ভিত্তি গাঁথতে হয়, তাহলে যে, বাংলা কবিতার নিতান্তই কবিজনোচিত ও উন্মার্গ সৌখীন চাল পরিত্যজ্য, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এবং যতদিন না গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা বাংলা কবিতায় হচ্ছে, ততদিন সামাজিক জীবনের অলিগলিতে বাংলা কবিতার যাতায়াত রুদ্ধ। আর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কবিতার পাঁচিল তিনিও ভাঙেন না, দরকার মতো শুধু গদ্যকে চমৎকার কাব্যমণ্ডিত করে' পাংক্তেয় করেন। কিন্তু কায়স্থরা পৈতা ধরলেই কি সমাজ-সংস্কার শেষ? বিকালে এলবার্ট্‌হলে বক্তৃতা দিয়ে বা চাঁদা দিয়ে ফ্রিরীডিংরুম করে, সন্ধ্যায় ড্রয়িংরুমে নাগরজীবন যাপন করার মতোই এ সংস্কার নিবারণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের আগেকার নানা গদ্য লেখায়, অবনীঠাকুরে, এমন কি

---

* কয়েকটি কবিতা ও গ্রহণ—শ্রীসময় সেন প্রণীত ও প্রকাশিত।

রমেশদত্তের জীবনসন্ধ্যায়, স্বভাবতই এই গদ্য চর্চা ঘটেছে। তফাৎ শুধু এই হয়তো যে সেকালে বড়ো বড়ো গদ্যরচনায় এই রঙীন অংশগুলি অংশমাত্র, আর একালে এগুলি সর্বস্ব করে' লিখলে ও লাইন ভাগ করে' ছাপলে তাদের নাম দেওয়া হয় গদ্যকবিতা।

একান্ত সুখের বিষয়, সমর সেনের কবিতায় সংস্কারের অন্যদিকে সম্ভাবনা আছে। তিনি ফর্মের দিক থেকে, আমাদের দুর্ভাগ্যত, কবিতা থেকে গদ্যে, গদ্য থেকে কবিতায় না গেলেও তাঁর ভাষাব্যবহার কবিতারই, গদ্যের নয়। ভাষা তাঁর অবশ্যই গদ্য ব্যাকরণের, কিন্তু তার প্রয়োগরীতি কবিতার মতো ঐন্দ্রজালিক, গদ্যের মতো বিতর্কবাহক নয়। প্রত্যয়প্রতিজ্ঞায় তাঁর মন চলে না, তাই তাঁর গদ্য কাব্যালঙ্কারে মণ্ডিত হয়ে নিজেকে ও পাঠককে স্তম্ভিত করে না; তাঁর কবিতার আধার স্বকীয় জগৎ বানিয়ে প্রজ্ঞাপথে এসে সাক্ষাতে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ীর সম্পূর্ণ সাযুজ্য তাঁর কবিতায় ঘটে, ফলে হয়তো ক্রোচের মতেই, কবিতা আর তার ভাষায় আলঙ্কারিক বুদ্ধির স্থান থাকে না। থাকে থাকে গদ্যপন্থী নির্বাহকাব্যে বাক্যবহুল তাই সমর সেনকে হতে হয় না, নাটকের পাত্রপাত্রীর মর্মোক্তির মতোই তাঁর কবিতা আমাদের সামনে একেবারে আবির্ভূত হয়। এই হিসাবেই পাউণ্ড-এর গদ্যকবিতা কবিতাপন্থী আর হুইট্‌ম্যানের কবিতা গদ্যপন্থী বলতে হয়। সমর সেনের যে সব কবিতায় বিষয়মাহাত্ম্য নেই, সেরকম একটি কবিতারই সঙ্গে, ধরা যাক্ "পুনশ্চ"-র কোনো কবিতা, যথা কোপাই নামে কবিতার তুলনা করলে কথাটা স্পষ্ট হবে।—

> ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
> বাতাসে ফুলের গন্ধ;
> বাতাসে ফুলের গন্ধ
> আর কিসের হাহাকার।
> ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি

গদ্যকবিতা

নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।

ঘনায়মান অন্ধকারে
করুণ আর্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করল
দীর্ঘ দ্রুত যান—
বিদ্যুতের মতো ঃ
কঠিন আর ভারি চাকা, আর মুখর—
অন্ধকারের মতো সুন্দর
অন্ধকারের মতো ভারি।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে দেখি ;
দেখি আর শুনি
গন্ধস্নিগ্ধ হাওয়ায় কিসের হাহাকার ঃ—
অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ,
দীর্ঘ লৌহরেখার সহসা শিহরণ—
আর অস্ফুট শীর্ণ বহুদূরে কিসের আর্তনাদ
কঠোর কঠিন।
বাতাসে ফুলের গন্ধ
আর কিসের হাহাকার।

এ কবিতাতে বিষয় মহৎ নয় এবং আবেগতাপও প্রবল নয়। সেই কারণেই এর কাব্যগুণ স্পষ্ট। আর এ কথাও বোঝা যায় যে সমর সেনের কাব্যলোকের জলবায়ুও একান্তই কবিতার, রবীন্দ্রনাথের কবিতাগানের। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো কবিতার নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা ও গান এবং লিপিকা,

শরৎ, আষাঢ় ইত্যাদি নানা লেখার মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত সমাজব্যাপী যে বর্তমান আবহ, সেই জলবায়ুই তাঁর সার্থক পট-ভূমি। সমর সেনের কবিতা যে কোনো লোকোত্তর শূন্যের জীব নয়, সেইটেই তাঁর কীর্তির সূচনা। তাই তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রনাথলালিত ক্লান্ত করুণ বিষাদ শালমহুয়া-বনে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে, চাঁদের পাণ্ডুর আলোয়, পাহাড়ের দূর নীলে, সহরের এলোমেলো গলিতে, দূর দিগন্তে স্থিতি পায়। আর সে স্থিতি স্বকীয় ভারসাম্য পায় কবির নিজের প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক দেহবিতৃষ্ণা আর ফিলিষ্টাইন শরীরসর্বস্বতার দ্বন্দ্বে আতুর ক্লান্ত আবেশে এবং সমাজ-জীবনের মর্মান্তিক ব্যর্থতাবোধে। এই ব্যর্থতাবোধের সম্ভাবনার জন্যই সমর সেনের বর্তমানে ক্ষান্ত না হয়ে পাঠকেরা তাঁর ভবিষ্যতে আশান্বিত।

ব্যক্তিস্বরূপের কি কৈবল্য থাকলে প্রথম যৌবনের আবেশকে জগচ্চিত্র না ভেবে সেই রোমান্টিকমন্যমাত্র ভাবকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তা হঠাৎ কল্পনা করা শক্ত। কিন্তু যখন এদিকে মোহিতলাল বা ওদিকে জীবনানন্দ দাশের মতো দক্ষ কবিকে এই সঙ্গতির অভাবে পীড়িত দেখি, তখন এই নবীন কবিকে প্রশংসা করতেই হয়। এবং এতই সৎ এই কবির ব্যক্তিস্বরূপ যে তাঁর মধ্যে এই শ্রেণিবিরোধের ব্যথা গোপনই আছে—কারণ তাঁর নিজের কবিপরিণতি, আর বাংলা কাব্যের বিকাশে এ ব্যথা এখন শিকড়ই গাঁথতে পারে, স্বভাবত বনস্পতি হয়ে' উঠতে পারে না। অথচ এই বিষয়ে আত্মবঞ্চনার লোভ সমর সেনের মতো সজাগ কবির কাছে যে বেগে আসতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। মার্কস এবং প্লেখানভের অনুমোদন কবিরই পক্ষে, শিষ্যেরা যাই বলুন।

তাই সমরের বিষাদ যৌবনোচিত বাসনা ও ক্লান্তির নেতিতেই উৎস খোঁজে। ফলে অন্যমনস্কের কাছে কয়েকটি কবিতা একঘেয়ে লাগতে পারে। তার যথার্থ কারণও আছে। যথারীতি পদ্য এবং সংস্কৃতজ গদ্যের গম্ভীর তালমানবিলম্বিত ছন্দের সফল প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য ও প্রচণ্ড জোর পাওয়া

যায়, তা সমর সেন অবহেলা করেছেন। তাঁর নেতিবাচক ছন্দ আর ভবিষ্যতের প্রবলসত্তাব্যঞ্জক ছন্দ একই রেশে বাজে। কয়েকটি কবিতায় তিনি ভিন্নপ্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু ১৯০০, বসন্তের গান, একটি প্রেমের কবিতা, সিনেমায়, মেঘদূত ইত্যাদি কি এদিক থেকে অন্যথা নয়? অবশ্য শিথিলসমাধি সব লেখকেরই হয়। আর গদ্য কবিতায় মুস্কিল হচ্ছে যে এখানে কোনো অধিদৈবত প্রমাণ বা প্রতিমাণ নেই, এমন কি কোনো কবিনিরপেক্ষ সংকেতিত মার্গও নেই। তাই কবির আবেগ এবং পাঠক এখানে মুখোমুখি বলে কান দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিপদে পড়ে। এবং সমর সেন যখন কাব্যের এই **Archetypal pattern** বা কৈলাসভাবনাহীন ক্ষুরধার পথই নিয়েছেন, তখন তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। প্রথম কবিতাতেই তিনি লাইনভাগে অনবহিত হয়েছেন। সে ত্রুটি Amor stands upon you-তেও দ্রষ্টব্য। নাগরিক-নামে উৎকৃষ্ট কবিতাতে তাই ৪২ লাইনে যে হুঁচট্ খেতে হয় তা কোনো নাটকীয় কারণে নয়। ২৫ পৃষ্ঠার মুক্তি-তে ডাষ্টবিনের সামনে মরা না হয়ে মরে যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায় সময় এখানে কাটে। মৃত্যু, পোষ্টগ্রাজুয়েটেও ছন্দ ঢিলা হয়ে গেছে এক আধবার। অবশ্য গদ্য কবিতার ছন্দের বাঁধুনিতেই এ অনিশ্চয়তা। আবেগই শুধু এ ছন্দের বেগ নির্দিষ্ট করে এবং দুই ব্যক্তির আবেগের মাত্রা এক চালে নাও চল্‌তে পারে। যথারীতি পদ্যে এক এক শ্লোকের বা যমকের বাঁধনে ছন্দ দানা বাঁধে, কিন্তু গদ্যকবিতার ছন্দের দম সম্পূর্ণতা পায় সমগ্র বক্তব্যের এক এক পর্যায়ে—**strophic unit**-এ। সমর সেন নিশ্চয়ই **strophic** সম্পূর্ণতা পেয়েছেন কয়েকটিদিন কবিতার নিপুণ এই শেষ পর্যায়ে:

> মড়কের কলরোল, নতুন শিশুর কান্না,
> চিরকাল বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সঙ্গম!
> অতীতের শবসম্ভোগী মন
> কালের স্থবিরযাত্রায় স্থির অশান্তি আনে।

আজ দুঃস্বপ্নে দেখি,
বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল
স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে ;
দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।—

আমার গলায় স্বভাবতই এর শেষ লাইনে চমক লাগে এবং পড়তে ইচ্ছা করে—শুব্ধ মহানদী। দু একবার বোধহয় শব্দ বা কথা সম্বন্ধেও কবির অসতর্ক ভাব দেখা যায়—লাইনের শেষে ক্রিয়া কঠিন বা বর্ণান্তক শব্দে, হতে শব্দটার সর্বদা ব্যবহারেও হয়তো, এবং বিশেষণের দুর্বলতায়, যথা চমৎকার কবিতা এই মদনভস্মের প্রার্থনায়—

মাস্তলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ন নাবিকের গান।

এ রকম জায়গায় মালার্মে বা বদলেয়র কি 'অদ্ভুত'বলে' স্থির থাকতেন ? সমর সেনের কবিতাতে এগুলি চোখে পড়ে, তিনি তো গদ্যকবিতায় লরেন্স-মার্গী নন, তিনি পাউণ্ড-পন্থী। ব্যুৎপত্তি বা ব্যাকরণার্থে তাঁর ছন্দ বা ভাষাপ্রয়োগ তো ঢিলা হবার কথা নয়, কারণ কবিতার উপযুক্ত তাঁর ভাষাব্যবহার ব্যঞ্জনায়, রূতার্থে গভীর, সমগ্র কাব্যের তাৎপর্যার্থে অখণ্ড।

কিন্তু ছিদ্রান্বেষীকেও থামতে হয়, এত সার্থক তাঁর অধিকাংশ রচনার আত্মস্থ শিল্পসৌন্দর্য। আর এ কবির মনই শুধু বৃহত্তর পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্বন্ধে উগ্র নয়, দৃষ্টিও প্রখর। বিস্মৃতি কবিতাতে এর ব্যতিক্রম হয়তো কেউ পাবেন, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞা রসঘন উপমাউপচারে অন্বিত। রাত্রি বা বিরহ নামে কবিতাগুলি প্রায় জাপানী কবিতার মতো সরল স্পষ্ট

ব্যঞ্জনায় গভীর, তাই রক্তকরবী, মহুয়ার দেশ ইত্যাদিতে উপমাউপচারের জটিলতার সহজ সাহস ও ব্যঞ্জনাঢ্যতা বিস্ময়কর লাগে। এবং এগুলি কবির গভীর চৈতন্যের মননজীব বলেই দেখি এই উপমাউপচারাদি এলিয়টের মতো মধ্যে মধ্যে হয়ে ওঠে symbol বা পরোক্ষপ্রতীক, যার লীলা বিশ্বজনীন। সেই জন্যেই একটু বিড়ম্বিত হতে হয় যখন একই প্রতীক কখনো পরোক্ষদীপ্ত হয়ে' ওঠে আর কখনো প্রত্যক্ষেই লুপ্ত হয়।

কিন্তু ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ এই নাগরিক কবিকে আশা দিয়েছে, সেই আমাদের আশা। তাঁর সম্পদ তাঁর মননে, যার সাহায্যে তাঁর আত্মজ্ঞান ব্যঙ্গে হয়ে' ওঠে নবসম্ভাবনায় চঞ্চল—শেষ কবিতা একটি বেকার প্রেমিক-এ—

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি
আর সহরের রাস্তায় কখনো প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি—
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙ্গে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

প্রগতিবাদী কবি *

আমার চেনাশোনার মধ্যে দু'জন তরুণ কবিকে আমার ঈর্ষ্যা হয়। তাঁরা দুজনেই একান্ত অল্পবয়স্ক, ছাত্র এবং কবিপ্রতিভান্বিত। তাঁদের একজন অবশ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যশোরশ্মি যাঁর দেশব্যাপী এবং মার্কসিষ্ট অঞ্চলে যিনি প্রতিনিধি বিশেষ। মণীন্দ্র রায়ের আরম্ভ তাঁর বন্ধুর মতো আপাতবিস্ময়কর নয়। কিন্তু কবিত্ব তাঁর অবিসংবাদী এবং প্রগতির স্বাস্থ্যে তাঁর স্বকীয়তার আভাস উজ্জ্বল।

হয়তো সে দীপ্তি কিঞ্চিৎ তির্যকচারী ব'লে ঈষৎ অস্পষ্ট। মণীন্দ্রের মনে সমাজচৈতন্যের বেদনাতেই হয়তো একটা বাঁকা হাসির ভাব আছে! সেটা প্রকাশ্যও ঠিক নয় কিন্তু একটা কিম্ভুত মজার ভাব—grotesquerie ও drollery এই মিশ্রণ মণীন্দ্রের পুস্তকাদির নাম দেওয়াতেই দ্রষ্টব্য। তাঁর ত্রিশঙ্কুমদন, ত্র্যম্বক বা একচক্ষু শুধু নামেই নয়, চেহারাতেও ঘাব্ড়ে দেবার মতো।

কিন্তু এই কিম্ভুত মজাদার চটক কাব্যের রূপে ছন্দের দক্ষতায়, বক্তব্যের চাপে সৌভাগ্যবশত সংযত হয়েছে। বলা যায়, রূপান্তরিতই হয়েছে কবিতার ঐশ্বর্যে, একটা দ্বিধাগ্রস্ত বৈদগ্ধ্যের আমেজে, যেটা পরিণত মনোবৃত্তির, জীবনের অভিজ্ঞতারই লক্ষণ। তাই প্রথম কবিতার যে আরম্ভ, তার গাম্ভীর্য হয়ে ওঠে স্বাভাবিক, আন্তরিক অথচ ভারিক্কে বা বামপন্থী বুলি নয়।—

ম্রিয়মাণ হৃতশক্তি হে স্বদেশ—

কারণ এ স্বদেশসম্ভাষণ সস্তার বহিরঙ্গবিলাস নয়। তা লেখকের আত্ম-

* একচক্ষু : মণীন্দ্র রায়

জিজ্ঞাসারই অবশ্যম্ভাবী ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বিকাশ। বহির্বিলাসী প্রগতিবাদের তুচ্ছতা ও অন্তবিলাসী আত্মসর্বস্বের ব্যর্থতার গ্লানি মুক্তি পায় যে মার্ক্সিষ্ট অবৈকল্যে, চৈতন্যের অখণ্ডতায়, মনে হয় তার আভাস মণীন্দ্রের কাব্যচৈতন্যে বর্তমান। অন্তত তার বোধ যে কবির আছে তার প্রমাণ একচক্ষু নামক কবিতায়—

তথাপি ছিলাম আমি প্রথামতো আত্মসচেতন,
প্রাণপণ যত্ন ছিল শান্তিকামী হৃদয়ে তখন।

যে একচক্ষু আত্মাভিমান আরেক চোখ চেয়ে

জনসভা ধর্মঘটে করেছি সতত
সাম্যের অনন্ত সুখ আমিও কীর্তিত।

—এবং ক'রেও জান্‌ল তাতে মুক্তি অসম্ভব।

এ দুর্যোগে নেই অব্যাহতি,
আমারে টানিছে মোর আত্মঅসঙ্গতি।

*　　*　　*

ভগ্নজানু এ কালের উজ্জীবনসম্ভাবনাহীন
নির্বাত বুদ্ধির শূন্যে একচক্ষু পলায়নে মরি মূর্খ বিভ্রান্ত হরিণ॥

অভ্যস্ত দক্ষিণ একচক্ষুপনা থেকে সস্তার বাম একচক্ষুপনার সহজ প্রলোভনে না ভুলে লেখক তাই খোঁজেন সত্তার সম্পূর্ণতা—কম্যুনিষ্টদের ভাষায় সততা দ্বন্দ্বাশ্রয়ী ভৌতিকবাদে যার দার্শনিক সমর্থন। লেখকের নানা কবিতায়—এমন কি প্রেমের কবিতাতেও এই সন্ধান দেখি। এবং অনেক জায়গায় তা কাব্যসার্থক হয়েছে: যথা, নব চতুর্দশপদীর ১ নম্বর, ৪ নম্বর ও ৫ নম্বর, উইঢিবি, নববর্ষ, বৈশাখ, পরস্পর, অক্রুর-সংবাদ, আশ্বাস, পঞ্চাঙ্কের (৪) ও (৫) ভাগ এবং অংশত সুভাষ-কে আবেদন:

এ কালসন্ধির ক্ষণে
কোন্ প্রভাতের দিকে চাহ তুমি ভাস্বর নয়নে
বলো বন্ধু? —……
……হে বান্ধব
এ অসাম্যদুর্যোগের তুমি তো উত্তর
পেয়ে গেছ। আমারেও শেখাও সে-স্তব।

আশা করি এ আবেদন সুভাষের কানে যাবে। কারণ মণীন্দ্রের রচনায় বুদ্ধির সততা থাকায় এবং কর্মীসুলভ বাধ্যতামূলক সরলীকরণের চেষ্টা না থাকায় তাঁর কাব্যধর্মে বিপ্লবটা অনেক বেশি সার্থক—হয়তো বা সুভাষের সাম্প্রতিক রচনাবলীর চেয়েও। অবশ্য কম্যুনিষ্ট ব্যবহারে এবং ফ্যাসিষ্টবিরোধী প্রচারে সুভাষের অধুনাতন লেখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান। এবং সে কাজে সারল্য অবশ্যম্ভাবী খানিকটা। কিন্তু তাতে কবিতার ক্ষতি কতটা, সেটাও ভাবা দরকার। কথাটা সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিস্ময়কর কবিপ্রতিভার বিষয়ে ভাবলে আরো স্পষ্ট হয়। তত্ত্বের দিক থেকে তাঁর মন মার্ক্সিসমের চরম পরিণতিতে পাকা কিন্তু তথ্যের দিক থেকে তাঁর চোখ কাণ মন—অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ কাব্যরূপে ভাল জমে না। বর্তমান প্রতিভার স্বাক্ষর তাঁর কাব্যে চমক লাগায় কিন্তু সে স্বাক্ষরে পরিণতির সম্ভাবনা গালামোহর করা। আর গভীরতা দূরে পরিহারে যে শেষ অবধি কবি তথা পাঠক কারো লাভ নেই, সেটাও মনে রাখা ভালো। একটা শুধু মহৎ লাভ হয়েছে স্বদেশপ্রেম ও ফ্যাসিষ্টবিরোধে। সেটা হচ্ছে যে প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক তাড়নায় বিলাসী বিপ্লব হয়ে উঠেছে সত্য এবং বুদ্ধির উপলব্ধি হয়েছে স্বভাবে অখণ্ড। সে সত্যের সারল্যে সুভাষের "পদাতিক" বই-এর কোনো কোনো কবিতার যে ভাবগত অস্পষ্টতা ও অসংহতি পীড়িত করে, তার পক্ষাপক্ষ দ্বিধা এখন নেই। মণীন্দ্রেরও এ দোষ ছিল, "একচক্ষু"-তে তার একাধিক উদাহরণ মেলে। সুখের বিষয়, মণীন্দ্রের সাম্প্রতিক কাব্যে সে সব দোষ প্রায় নেই। তাছাড়া তাঁর ছন্দ-

ভাষার উপরে বিস্ময়কর কর্তৃত্ব আজকাল যে সদাজাগ্রত লেখনী ও কানের পরিচয় দেয়, সেটা জাগ্রত মনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে ব'লে আমি তাঁর ভবিষ্যতে শ্রদ্ধাবান। আশা করি সুভাষের কবিপ্রতিভা ও চরিত্রবান সমাজকর্মিষ্ঠতার নেতৃত্ব এবং চঞ্চল চট্টোপাধ্যারে সঙ্গে মণীন্দ্রের গম্ভীর কাব্যজিজ্ঞাসার মিলিত বন্ধুত্বে আমাদের পথ সহজ হবে। কারণ মণীন্দ্রের একটা ঝোঁক আছে ভাবালু অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে, যাতে বিকাশ রুদ্ধ।

বুদ্ধিবাদীর উপন্যাস *

জ্ঞানী সমালোচকের সঙ্গে অন্তত এক বিষয়ে সাধারণ পাঠক সায় দিতে পারে যে চরিত্রপাত্রের মাহাত্ম্যেই উপন্যাসের মুখ্য সার্থকতা। উপন্যাসে চরিত্রপাত্রের অস্তিত্ব অবশ্য একাধিকলোকেও সম্ভব। বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে ঝোঁকটা বহির্জগতের উপর পড়তে পারে, ব্যক্তির উপরেও পড়তে পারে। সেই অনুসারে পাত্রপাত্রীর চরিত্র অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বা গতিচঞ্চল হয়। আবার তাদের স্বভাব অন্তর্মুখ বা বহিরঙ্গ হওয়াও আশ্চর্য নয়।

ধূর্জটিবাবু সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানী পাঠকের নানারকম আপত্তিতে আমার মতো সাধারণ পাঠকদের কিংকর্তব্যবিমোহ খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে যখন বোঝা যায় না যে উক্ত জ্ঞানী সমালোচকেরা, যাকে বলে মূল্যজ্ঞান, সেই জগচ্চিত্রজ শ্রেয় প্রেয়ের মানদণ্ডে তাঁকে বিচার করেন কিম্বা এরিষ্টটেলীয় প্রতিভাসযাথার্থ্য নিরূপণেই তাঁরা ব্যস্ত।

কারণ ধূর্জটিবাবু সম্বন্ধে আমাদের মুস্কিল হচ্ছে যে তিনি শুধু গল্প বা উপন্যাস লেখক নন, তিনি প্রবন্ধও লেখেন এবং তাঁর প্রসারে এবং প্রসঙ্গে তাঁর দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য স্বয়ম্প্রকাশ। তাই পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে প্রতিযোগী পাণ্ডিত্যাভিমানীদের আপত্তিও হয়ত ধূর্জটিবাবুর গল্প-উপন্যাসের সম্বন্ধে অনেককে দ্বিধান্বিত করে। অবশ্য প্লেটনীয় আপত্তিও তাঁর উপন্যাস সম্বন্ধে কেউ কেউ হয়তো করেন, কিন্তু সে আপত্তি ত সব সাহিত্যিকেরই ভাগ্যে বর্তমান।

---

* আবর্ত—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

তাঁর ভাষা সম্বন্ধে আপত্তি বরং আরো বিবেচ্য। তাঁর প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধেও এ আপত্তি উঠেছে নানামুখেই। সেখানে হয়তো খানিকটা ধূর্জটিবাবু দায়ীও। কারণ আমরা তথ্যান্বেষী; পণ্ডিত লেখকের কাছে আমরা পাঠ নিতে চাই, প্রবন্ধে তাই আমরা পাঠশালার আবহাওয়া খুঁজি, খামখেয়ালী শিল্পীর বহুধাভক্ত গ্রন্থবিহারে আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়ি, ভুলে' যাই যে অধ্যাপক শিক্ষকের বিদ্যালয়োত্তর জ্ঞানপ্রচার বেকন কিছু করলেও বার্টন করেন নি, ফ্লোরিওর কাছে শেক্‌স্‌পিয়রও কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিও রেমোঁ সেবোঁ-র পরিচয়ে বিশ্বকোষের কৃপণ সেবকদের তথ্যবৃদ্ধি হয় না। এবং এখানে ধূর্জটিবাবুরও ভুল হয়ে যায়; তাই তিনি ইলিয়ার চর্যা ছেড়ে অধ্যাপকী প্রবন্ধ লিখে ফেলে নিজেকে এবং পাঠককে দু নৌকায় দাঁড় করিয়ে দেন। আর এই দুই ভিন্নজগতের দ্বিধায় তাঁর প্রসঙ্গনির্ণয় বাক্যবিন্যাসাদি অর্থাৎ এককথায় ভাষাব্যবহার বিড়ম্বিত হয়ে' ওঠে; শব্দের অভিধায় তাঁর স্বকীয় ভাষার লক্ষণা হারিয়ে যায়; যে স্থায়ীভাবে তাঁর রচনার পুরুষার্থ, সেই শুদ্ধবাসনামূলক তাঁর সাধারণ্য তথ্যের অরণ্যে, বা ব্যুৎপত্তিতে কণ্টকাকীর্ণ নির্বাহের অন্ধকারে অনিশ্চিত হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু গল্পের বা উপন্যাসের উপলক্ষ্যই অন্য হওয়ায় ধূর্জটিবাবুর ব্যক্তি-স্বরূপ ও তাঁর সাধনা সার্থকতর মার্গ পায়। তাঁর দংশন শুধু গ্রন্থলোকেই প্রবল নয়, ব্যক্তিতেও তা ক্লান্তিহীন। যে কারণে উপরোক্ত আপত্তি তাঁর প্রবন্ধ সম্বন্ধে ওঠে, ব্যক্তিস্বরূপের সেই বিশেষত্বেই সামাজিক মানুষ সম্বন্ধে তাঁর চৈতন্য প্রখর। সেইটেই তাঁর কীর্তির পক্ষে যথেষ্ট আর কিছু যদি তাঁর নাই থাকে। কারণ আমাদের নতুন সভ্যতায় নতুন সমাজ এই দেড়শ বছর মাত্র দেখতে হচ্ছে। সমাজের নানা স্তর ভাঙছে গড়ছে। তার মধ্যে শুধু কবিতার সরল আদিম চৈতন্যের হৃদয়-সংবেদ্যতায় কাজ গভীরে চললেও নানামুখিত্ব চৈতন্যলোকে আনতে হলে দরকার জটিল বহিরাশ্রয়ী সাকার তেত্রিশ কোটির বাহন গদ্য এবং রসাত্মক গদ্যরচনা। সেই

জন্যেই ত বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক বা জাতীয়তঘটিত মূল্য ছাড়াও যা কিছু সামান্য মূল্য থাকে, নাহলে মাইকেলের মনীষা বা কবিপ্রতিভা যারা বুঝেছে, বা দীনবন্ধুর মানবিকতার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে যারা তৃপ্ত, তারা বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রাহ্য মাত্র করলেন কেন? অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র শুধু শিল্প নয়, এই চৈতন্যসঞ্চারেও ফাঁকি দিয়েছেন। আমাদের বর্তমান অতীতে ও ভবিষ্যতে জড়িত, তিনি অতীতকে নিয়েই ব্যর্থশ্রম হয়েছেন। যেহেতু ইতিহাস চলে ভবিষ্যতের দিকেই নাক-বরাবর এবং আমরা সবাই অনিচ্ছায় বা অজ্ঞানেও ইতিহাসের একসঙ্গেই পাত্রাধার, আকাশনীড়, সেই হেতু আমরা রবীন্দ্রনাথকে বারম্বার অদম্য কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই জন্যেই আমরা অনুরূপা দেবীর ফিল্‌ম্ সাফল্য সত্ত্বেও মোটামুটি শরৎচন্দ্রের চৈতন্যসঞ্চারের চেষ্টায় অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের বোধন প্রয়াসে কৃতজ্ঞ হতুম। কারণ রাস্তায় যখন চলতে হবেই, তখন সঙ্গী যদি পথের আভাস না দিয়ে ভূতেরা কি রকম পিছু হেঁটে বা শূন্যে লাফিয়েই চলে, সে বিষয়ে খুব বাস্তবপন্থী বর্ণনাও দেন, ত তাতে লাভ কি?

ধূর্জটিবাবুও এই জন্যেই আমাদের কৃতজ্ঞাভাজন। বিভূতিভূষণ হয়তো সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁর "পথের পাঁচালী"-তে, কিন্তু সে পথ প্রায় প্রাকপুরাণিক এবং তিনি এই প্রাক্‌পুরাণিক জগতের সঙ্গে বর্তমান জগতের দ্বন্দ্বে তাঁর অপুকে ট্রাজিক্ হিরো বলে'ও ভাব্‌তে পারেন নি, সে অপরাজিত মাত্র, কোন দ্বন্দ্বে যে, সেটা মনে হয় গ্রন্থকারও জানা দরকার মনে করেন না। ধূর্জটিবাবু হয়তো এখনো সিদ্ধিলাভ করেন নি তাঁর সাধনায়, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি জীবনধর্ম্মী। তাই বাংলা সাহিত্যের দুরবস্থায় যথেষ্ট লাভ, বিশেষতঃ যখন দেখি প্রেমেন্দ্র বা বুদ্ধদেবের মতো দক্ষ লেখকেরা বারবার আশান্বিত করে'ও শেষ পর্যন্ত প্রায়ই আশাভঙ্গ করেছেন।

অন্তঃশীলা ও আবর্ত দুই উপন্যাসেই বা এক উপন্যাসের দুইভাগেই

তাই দেখি যে, মানুষগুলি সমাজের যে অংশে মনন ভবিষ্যৎঘেঁষা, সেই পাড়ার বাসিন্দা। এবং তাদের নিয়ে যে জগৎ বা অবস্থান, সে বিষয়ে লেখক শুধু সজাগ নয়, সেই পরিস্থিতির উপরেই তাঁর আশা ভরসা বোধহয় জমে' উঠ্ছে। তাই তাঁর পাত্রচরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা প্রাণহীন বা যাথার্থ্যহীন বলে' আপত্তি করেন, তাঁদের কাছে এই বক্তব্য—

But this conclusion is reached without any direct examination of character as an illusion or as a symbol at all, for "character" is merely the term by which the reader alludes to an author's verbal arrangements. Uufortunately, that image once composed, it can be criticized from many irrelevant angles—its moral, political social, or religious significance considerd, all as though it possessed actual objectivity, were a figure of the inferior realm of life, And because the annual cataract of serious fiction is as full of "life like" little figures of such, and no more, significance as drinking water is of infusoria······the meagre stream of genuine literature, being burdened with "the forms of things unknown," is anxiously traced to its hypothetical source—a veritable psychologico-biographical bog.

কারণ পাত্রপাত্রীচরিত্র উপন্যাসে আসলে একটা স্বসমুত্থ বা ইমার্জেণ্ট ব্যাপার। লেখকের পুরুষার্থ ও তাৎপর্যার্থের আবশ্যিকতায় যে ছন্দ সমগ্র রচনার অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই ছন্দের নির্দেশে, ভাষা ব্যবহারে, প্লটগতিতে, গল্পের বিকাশেই পাত্রপাত্রীর আবির্ভাব। শুধু চরিত্রই যদি উপন্যাসের উৎস হত, তাহলে টলষ্টয়ের সমর ও শান্তি, হোমারের ওডিসি,

বা রবীন্দ্রনাথের গোরা, এমন কি প্রুস্তের অতীতের অন্বেষণে-র মতো ব্যক্তিমনসর্বস্ব উপন্যাসেও কার্যকারণ নির্ণয় করা যেত না। সুখের বিষয় ধূর্জটিবাবুও পুরুষার্থ যে তাৎপর্যার্থেই অস্তিত্ব পায়, এ কথা বোঝেন। আর এ কথাও স্বীকার্য যে তাঁর অন্তত দু'একটি পাত্র তাদের বিশেষ অবস্থানে থেকেই প্রাণৈশ্বর্যে প্রায় স্বয়ন্তর। খগেনবাবু আজ খগেনবাবুর শত্রুদের কাছেও মূর্ত। সুজনও খানিকটা—যদিচ সুজন অন্তঃশীলা-য় সামান্য দুচার কথায় যে যাথার্থ্য পায়, আবর্ত-তে বহু বাক্যব্যয়েও তার বিপরীত দেখে আশ্চর্য লাগে। অন্তঃশীলা-য় ধূর্জটিবাবু আত্মনেপদের আভ্যাসিক আশ্রয়ে অর্থ-নিশ্চিত অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও যে তিনি আবর্ত-তে বহিবাশ্রয়ী তীর্থযাত্রা করেছেন, সে জন্যে তাঁর শিল্পশ্রদ্ধা ও সাধনার নিষ্কামতা বিস্ময়কর। কিন্তু প্রথম ভাগে যার সামান্য আভাস আছে দ্বিতীয় ভাগে সেই আভাস তাঁর উপন্যাসের ক্ষতি করে' লেখকের সাহসী উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে' দেয়। অবশ্য বাংলাসাহিত্যের কতটুকু সহায়তা তিনি পেয়েছেন, তা দেখলে তাঁর কীর্তিই শুধু বিবেচ্য হয়ে' পড়ে, ত্রুটি নয়।

আর বিশেষ করে' সে ত্রুটি যদি নেহাৎ শিল্পত্রুটি না হয়, যদি লেখকের ব্যক্তিস্বরূপের বিশেষত্বই হয়, তাহলে সে বিষয়ে হাহুতাশ করা নির্বোধ পাঠকের অকৃতজ্ঞতামাত্র। রমলাদেবীর চরিত্র যদি পটভূমি না পেয়ে থাকে বা সুজনের জীবিকা ও জীবনযাত্রার চৈতন্য লেখক যদি পাঠকগোচর না করে থাকেন, ত সেটা তঁার হাতের বাইরেই ধরতে হবে। হয়তো ধূর্জটিবাবুর জগচ্চিত্র এখনও অস্পষ্ট, হয়তো তিনি পুরুষার্থ সম্বন্ধে অনিশ্চিত। হয়তো তাই আবশ্যিক ছন্দ তাঁর মধ্যে মধ্যে কেন্দ্রচ্যুত হয়, পাত্রপাত্রী আশ্চর্য ঘটনাবিন্যাস সত্ত্বেও সব সময়ে ঠিক বোঝা যায় না। এবং তাঁর কাটা কাটা বাক্যবিন্যাস যা অনেকের মধুরাভ্যস্ত কানে খারাপ লাগে কিন্তু যা তাঁর ছন্দের পুরুষার্থের অনন্যগতি, তাও ঘুলিয়ে ওঠে।

এবং এমন সব উপমা আসে, যেগুলি সংস্কৃতরীতির সংকেতিতমার্গে হয়তো আশ্চর্য দক্ষ, কিন্তু ধূর্জটিবাবুর সক্রিয়, আধুনিক ভাষায় খাপছাড়াই মনে হয়।

মনে হয় এ সমস্তই আসলে ধূর্জটিবাবুর মধ্যে একটা রুচিবাগীশ নীতি-পরায়ণ উত্তরাধিকারের জন্যেই ঘটে। নিরক্ত ও বিলম্বিত ভিক্টোরিয়ান্ অলডাস্ হাক্স্লির মতো ধূর্জটিবাবু ট্রাজিক্ ও সাটিরিকের দ্বিধায় অনিশ্চিত। প্রবল প্রেম বা প্রচণ্ড ঘৃণা কিছুই তাঁর উপন্যাসের মানুষেরা তাঁর কাছে যেন পায় না। তিনি যেন মনে হয় প্রায়ই ক্লান্ত, বিমুখ। এবং লেখক তাঁর জগৎ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ বা bored হবার আভাস দিলে, সে জগতের বাসিন্দারাও প্রায় শুধু বিতৃষ্ণ নয়, বিতৃষ্ণাকর হবার সম্ভাবনাও এসে পড়ে।

কিন্তু আবর্ত তৃতীয়ভাগের অপেক্ষা রাখে। হয়তো সে ভাগ বেরোলে সবশুদ্ধ জড়িয়ে ধরলে এসব আপত্তিই অবান্তর হবে। সেই আমাদের আশা এবং সে আশা লেখকেরই ইতিমধ্যের সাফল্যে প্রণোদিত।

রিচার্ডসের কল্পনা

সম্প্রতি এজ্‌রা পাউণ্ডের প্রবন্ধ সংগ্রহে তাঁর কাব্যাদর্শের কথা পড়ছিলুম। তারপরে বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া পড়ে' আশ্চর্য্য হলুম উভয়ের কাব্যাদর্শের অনগভীর মিলে। তাই বেন্থামী রিচার্ড্‌স্‌ও যে নভশ্চারী কোলরিজে পাবেন তাঁর শ্রুতি, তাতে আর কি আশ্চর্য। রিচার্ডসের গভীর পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞাননিষ্ঠা ও থিসিস্‌-জাতীয় পরিশ্রমকে ধন্যবাদ। বইটি কোল্‌রিজ-ভাষ্য শুধু নয়, কোল্‌রিজসংস্কারও বটে। কোল্‌রিজ্‌ কাব্য বল্‌তে শুধু কবিতা বুঝতেন না; কাব্য মানবজীবনে পরম প্রয়োজন ও মূল্যবান্‌ এ বিশ্বাস তাঁর ছিল; রিচার্ডসেরও আছে। কাব্য সমগ্র মানবের সম্পূর্ণ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যক্তির অখণ্ড চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্তি, এ কথাও রিচার্ডস্‌ মানেন। কিন্তু এই মুক্তিলাভ ও তার প্রক্রিয়া পারলৌকিক লীলা, কোলরিজের এ কথা মানতে তাঁর বাধে। রিচার্ডস্‌ বলেন, ঈশ্বর আমাদের কাছে আজ মৃত হলেও আমাদের মুক্তির প্রয়োজন উগ্রই আছে এবং কাব্য সে মুক্তির ফোয়ারা বহন করবে, ঈশ্বর মানার মতো অবৈজ্ঞানিক দাবী জারি না ক'রে। পৃথিবী ভারসাম্য হারিয়েছে, সভ্যতা দিশাহারা, মানুষ আজ ভ্রান্তির জীবনশোষক গোলকধাঁধায়। ধর্মপ্রেমআদি সব বিশ্বাসের আশ্রয় আজ ভেঙেছে, এখন অন্ধজনে আলো কে দেবে? না, এই শিশুতীর্থের নবশিশু, কাব্য। অথচ কাব্য প্রাণ পেয়েছে বিজ্ঞানপূর্বজ ঐ সব বাতিল বিশ্বাসের আশ্রয়েই। অবশ্য এ বৈজ্ঞানিকমন্য নাটকীয় ভাব রিচার্ডসের এ বইটিতে কমেছে।

এবং রিচার্ডস্‌ পাঠকের কাছে প্রায় সর্বদা যে বুদ্ধির জাগ্রত অবস্থা দাবী করেন, এ বইয়ে তা না কমে' বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে। তাঁর তীক্ষ্ণসতর্কতা ও

রুচিমণ্ডিত পাণ্ডিত্য স্বাস্থ্যকর। বহুকষ্টসাধ্য স্পষ্টতা বর্তমান বলে'ই তাঁর কথায় মতান্তর ঘটা সহজ, যদিও তাঁর সুবিন্যস্ত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া শক্ত। অবশ্য কেম্ব্রিজের কূটবুদ্ধি পণ্ডিতের সঙ্গে কোলরিজের অনেক বিষয়ে মতৈক্য। কোলরিজের সঙ্গে রিচার্ডস্ বিশ্বাস করেন যে বিশেষ অবস্থায় মানুষের চেতনা হয়ে ওঠে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদাতীত মিলনে স্বচ্ছ। দুজনেরই মতে এই অসাধারণ অপিচ ক্ষণস্থায়ী দিব্যজ্ঞান অতিশয় মূল্যবান। সেণ্ট টমাস করেছিলেন এই অন্তর্জ্ঞানকে যোগ-সাধনার যাত্রাপথ। কোলরিজও এর মধ্যে পেয়েছেন পরমার্থের ইঙ্গিত। এবং তিনজনেই—সেণ্ট টমাস্ অবশ্য কথাটা ব্যবহার করেননি—এর সঙ্গে দেখেছেন শুদ্ধ কল্পনার সম্বন্ধ। এই শুদ্ধ কল্পনা কোলরিজের মতো ব্যবহারিক ও নৈতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেই জন্যেই নাকি শেক্স্পিয়র gentle। গিলবি কিন্তু কবিদের জীবনে গোলযোগই দেখেন। তবে আধুনিক কবিজীবনী লেখার রীতি ত কোলরিজ দেখেন নি, আর ভেরলেন, বদলেয়র প্রভৃতিও তখন জন্মান্ নি। প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো যে কবি দার্শনিক সঙ্গীতকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের নিয়ে মনোবিজ্ঞানে কাজ চলেছে এবং কেন যে দিব্য জ্ঞানবান কবিতার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জীবন মানিয়ে নিতে পারে না, সে মানস-জাগতিক প্রশ্ন হয়তো একদা উত্তর পাবে। বিজ্ঞানের এ সিদ্ধি সম্বন্ধে রিচার্ডসের বিশ্বাস প্রচণ্ড—যদিচ তিনি মার্ক্সিস্ট বস্তু-বাদের দ্বন্দ্বে সমস্যার সমাধান পান নি।

কোল্‌রিজ্ শুধু এই বিজ্ঞানের বর্ণনায় ক্ষান্ত হন নি। এই জ্ঞানের মাত্রা যে সামাজিক সভ্যতার ওপর নির্ভর করে, সে সত্যও গত শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর চোখে পড়েছিল। এবং আত্মজ্ঞানের ফলই শুধু বুদ্ধিগত নয়, এ জ্ঞান একটা ক্রিয়া ও একটা নির্মাণ, আর এ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় সঙ্গে সঙ্গে নবমূর্তি লাভে, নব আত্মপ্রকাশে। তার ফলে আসে শুদ্ধকল্পনা। রিচার্ডসের আয়াসসাধ্য পুনর্ভাষ্যে বুঝলুম যে কোলরিজের মতে এই সঞ্জীবনী কল্পনার শ্রেষ্ঠ-

রূপ কাব্য হলেও এ অক্ষয় বটের শুভফল অন্যত্রও ফলে। যা কিছু অভ্যাসজর্জর জীবযাত্রার একান্ত প্রয়োজনসাধনের বাইরে, যা কিছু সুকুমার মানসক্রিয়া, তারই মধ্যে এ শুভের লীলা। সেণ্ট্‌ টমাসের মতে এই লীলার চরম ও শুদ্ধতম রূপ ঈশ্বরের প্রেমে। কুয়াসাচ্ছন্ন কোলরিজেরও এরকম একটা ধারণা ছিল। এ বিজ্ঞানছাড়া ঈশ্বরের কথা রিচার্ডসের কাছে অসম্বন্ধ। তিন জনের মিল জীবন-যাত্রায় কাব্যের উচ্চস্থান সম্বন্ধে। কোলরিজ ও রিচার্ডস্‌ তো স্পষ্টত কাব্যকে জীবন-যাত্রার প্রধান সহায় বলেছেন। এবং বিকল্পনা বা কল্পনাবিলাসের মূল্য যে কম ও তার স্থান নিচে, এর কারণ বিকল্পনা আর শুদ্ধকল্পনার তফাৎ প্রায় ততখানি, জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে সজ্ঞান স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া ও জড় অভ্যাসজাত ক্রিয়ার মধ্যে যতটা। এই খানেই হার্ট্‌লিকে ছেড়ে কোল্‌রিজে কাণ্টের অনুগমন। এইখানেই ক্ষমতাবানে প্রতিভাশালীতে ভেদ। এ-প্রসঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতায় কোল্‌রিজের বিশ্বাস নিয়ে বস্তুতান্ত্রিক রিচার্ডস্‌ একটু অসুবিধায় পড়ে' একটা যাহোক্‌ তাহোক্‌ প্রাক্‌-নিয়ন্ত্রী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অমার্ক্সীয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এ ছাড়া অবশ্য উপায়ও নাই। এখানে রিচার্ডস্‌ সততা-সহকারে মেনেছেন যে ব্যক্তি ও বহির্জগতের সম্বন্ধ-সমস্যা শুধু ব্যক্তি-বাদীকে বিচলিত নয়, বস্তুতান্ত্রিককেও ভাবিত করে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ও উদ্ধৃতিবহুল এ আলোচনার আরেক কথা হচ্ছে কল্পনা-বিকল্পনার সঙ্গে বিকার বা delirium ও mania বা উন্মত্ততার তুলনা। চলিত কথায় যে কবিকে পাগলের জাতে না হোক, মাথায় ছিটওয়ালার দলে ফেলে, সে ভুল অবশ্য এ তুলনায় নেই। কারণ বিকল্পনা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা হলেও কল্পনার স্পষ্ট তিলক হচ্ছে তার চিন্তা-ক্রিয়া ও সঞ্চয়ী স্মৃতির ঐশ্বর্য। বিকল্পনা এ-কল্পনারই জের তবে তাতে কল্পনার সদ্য-চেতন অবৈকল্য নেই। সেইজন্যেই কল্পনাবিলাস আমাদের অভিভূত করে না, করে চমৎকৃত। তার উৎকৃষ্ট আলোচনা কোল্‌রিজ

করে গেছেন গ্রে ও কূলির কবিতা নিয়ে ও ভিনাস এণ্ড অ্যাডনিস্ থেকে দুই জাতীয় কয়েকটি লাইন তুলে। সে উপলক্ষে রিচার্ডস্ উৎকৃষ্ট টীকা করেছেন। এ টীকা বিচারবুদ্ধির সাধারণ প্রয়োগেও সার্থক। যথা ডিটেকটিভ নভেলকে রিচার্ডস্ বিকল্পনার পর্যায়ে ফেলেন, "টু দি লাইট্ হাউস্" বা "টম্ জোনস্"-কে কল্পনার। অথবা হার্ডির নভেলে তিনি পান খণ্ডে খণ্ডে কল্পনা কিন্তু সমগ্রে শুধু বিকল্পনা। অবশ্য এ ভেদজ্ঞান সহজ নয়। কারণ মানবমনে ঘটনা সব যে এক জাতের নয়, সে বোধের উপর এ ভেদজ্ঞানের ভিত্তি এবং এই ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে জানলেই হবে না, জানতে হবে সমস্ত মনের হিসাবে। এবং তাও শুধু ব্যক্তিবিশেষেব মনেই শেষ নয, তার মধ্যে মেরুদণ্ডরূপে থাকবে সর্ব মানবের বিশেষত্ব। অর্থাৎ আমরা এসেছি ভ্যালিউস্ বা তুলামূল্যের জগতে। এ মূল্যের ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিক আপেক্ষিকতার মার্ক্সীয় জটিলতায় রিচার্ডস্ নামেন নি। বলেছেন কল্পনাবিচারে সৌভাগ্যবশত মূল্য-মানদণ্ড না নিয়ে কথা বলা যায়। কারণ সাধারণ সভ্যমানুষ মাত্রেরই কখনো না কখনো কল্পনার সঙ্গে দেখা শুনা হয়েছে। কিন্তু মুখচেনা জ্ঞানকে বিচারের ভিত্তি কর্‌লে যে ব্যক্তিনিবিশেষ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা হয না, সে কথা বৈজ্ঞানিক রিচার্ডস্ চেপে গেছেন— মনোবিজ্ঞানের শৈশবের জন্যে বাধ্য হয়ে'। অথচ সুধী কাব্যজ্ঞদের মধ্যেই মতভেদ আছে। গ্রে এবং কূলি সম্বন্ধে কোল্‌রিজের কল্পনা-বিকল্পনা বিচার রিচার্ডস্ মানতে পারেন না।

অতঃপর শব্দার্থতাত্ত্বিক আলোচনা। শব্দার্থতত্ত্ব যে গভীর মেধায় চর্চনীয় বিজ্ঞান সে বলাই বাহুল্য। রিচার্ডস্ পূর্বে এ বিষয়ে অন্যতম অগ্রদূত দুটি বই লিখে আমাদের কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। কোলরিজের প্রাগাধুনিক আশ্চর্য দূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টিও সেমাসিওলজির বিপ্লববহ মাহাত্ম্য দেখেছিল। কোলরিজের সেই নানা কারণে অসম্পূর্ণ তবুও মহান চেষ্টা থেকে রিচার্ডস্ শব্দার্থের রহস্য ধরবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যদিচ

মোটা ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি পেয়েছে, একটু ভেতরে গেলেই আমরা পড়ি আবার অন্ধকারে। অবশ্য শব্দার্থের রহস্যেতিহাস না জানলেও আমরা ফস্‌লের রিচার্ডস গ্রেভস্ এম্‌প্‌সনাদির সাহায্যে পূর্ণতর পাঠরীতি শিখছি। তাছাড়া সাধারণ ভাবে রিচার্ডসের আলোচনা যদিও অসম্পূর্ণ, তবুও উপকারেই লাগবে। যথা, সব চেয়ে মোটা কথাই ধরা যাক, কথা বা শব্দ সর্বদা অর্থৈকক বা স্বসম্পূর্ণ অর্থপিণ্ড নয়। এ জ্ঞান যে অনেকের নেই, তার প্রমাণ সুধী পণ্ডিত হর্বার্ট্‌ রীডের একটি বচন: কাব্য একটি কবিতায় বা একটি লাইনে বা একটি দুটি কথায় থাকতে পারে,—উদাহরণ, শেক্‌স্‌পিয়ারের incarnadine, কীটসের shady sadness, কোলরিজের Mount Abora ইত্যাদি। অথচ ওষ্ঠরঞ্জনের বিজ্ঞাপনে incarnadine দিলে multitudinous seas লাল হয়ে ওঠে না।

এ সম্পর্কে কল্পনা-বিকল্পনা প্রয়োগ শিরোধার্য। যেখানে এ মানসক্রিয়ায় উক্ত কথাগুলি সার্থক-সংযোগে কাব্য হ'য়ে ওঠে সেখানে পাই শুদ্ধকল্পনা। বিপরীতে অর্থাৎ কথার একক অর্থের, আভিধানিক অর্থের প্রাধান্য যেখানে, সেখানে বিকল্পনা। যথা এই শ্লোকে কথাগুলির অর্থ অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র:—

> Through wood and dale the sacred river ran,
> Then reached the caverns measureless to man,
> And sank in tumult to a lifeless ocean

কিন্তু এ শ্লোকে কথার অর্থ অভিধান ফেলে সমগ্র কাব্যে ছড়িয়ে গেছে:—

> She looks like sleep—
> As she would catch another Amtony
> In her strong toil of grace.

তারপরে কোল্‌রিজের "শুভবুদ্ধির" বিচার হল রিচার্ড্‌সের আলোচ্য।

এ শুভবুদ্ধির অস্তিত্ববিনা কল্পনা হয়ে ওঠে প্রলাপী বিকার, বিকল্পনা হয় মহাব্যসন। মুস্কিল হচ্ছে এই শুভবুদ্ধির মাত্রা নির্ণয়ে। কোল্‌রিজ্ বিকল্পনাবিহারী কূলির যে পিণ্ডারীয় ওড-এ শুভবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব দেখছেন, রিচার্ডস্ তাতে বিকল্পনাই পেয়েছেন—যদিও নিচুদরের বিকল্পনা। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জের দর রিচার্ডস্ আজও বাঁধতে পারেন নি, কাজেই নিচু দর উঁচু দর অস্পষ্ট কথাই রইল। কোল্‌রিজের মতে এ শুভবুদ্ধি আসে ব্যাকরণ, ন্যায় ও মনোবিজ্ঞানের সহজ বা জাত জ্ঞানে। এবং জ্ঞান হচ্ছে তাই যা কালে হয়ে' উঠতে পারে ক্ষমতা, পাওআর। এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের জ্ঞান অদ্যাবধি পরিমিত। রিচার্ডস্ তাই ভাবীকালের দিকে দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে' বলেছেন যে একদা বিজ্ঞানের নিশ্চিত নিকষে কবিতার ভালোমন্দের নির্বিশেষ বিচার করা যাবে। ইতিমধ্যে তিনি মেনেছেন কোল্‌রিজকৃত Reason-এর জয়গানের জটিল সার্থকতা।

কোল্‌রিজের কবিতায় 'বায়ু-বীণা'র রূপক সবার পরিচিত। বায়ুবীণা নামে পরের অধ্যায়ে রিচার্ডসের সূক্ষ্ম বিচারের বিষয় হচ্ছে নিসর্গ সম্বন্ধে কোল্‌রিজের দুটি মতবাদ। সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচিত সে মত দুটি রিচার্ডসের কঠিন-শব্দ-সঙ্কুল নব বেশে হচ্ছে এই ঃ—

The mind of tbe poet at moments, penetrating 'the film of familiarity and selfish solicitude,' gains an insight into reality, reads Nature as a symbol of something behind or within Nature not ordinarily perceived। এবং The mind of the poet creates a Natnre into which his own feelings his aspirations and and apprehensions, are projected.

রিচার্ডস্ স্থির করতে পেরেছেন যে অন্তত এ মত দুটি যথার্থ-ই মানসিক ব্যাপার। কিন্তু সতর্ক বিচারে সাবধানী ভাষায় প্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতির চার

রকম অর্থ ও তার বর্ণনা রিচার্ড্‌স্‌ করেছেন। প্রথম অর্থে প্রকৃতি শুদ্ধ, মানব মনের আয়ত্তের বাইরে, স্বাধীন, দুর্জ্ঞেয় এবং মানুষের ওপর প্রভাববিস্তারে সমর্থ এ প্রকৃতিতে মানসলোক আরোপ করতে মানবীয় কল্পনা অক্ষম। দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মানব মনের লীলাক্ষেত্র। এ লীলায় ভণ্ডামি নেই, কিন্তু যে সব রূপ গুণ এতে প্রকৃতির উপরে আরোপিত হয়, তারা সব mythical। রিচার্ডসের এক অধ্যায় হলো পৌরাণিকের সীমানির্দেশ। যাঁরা fiction-এর সঙ্গে ও রিচার্ডসের বিশ্বাস বা belief-এর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এ অধ্যায়ে খুসি হবেন। বলা বাহুল্য, আমাদের জীবন-যাত্রায় একান্ত প্রয়োজন এই সব বিশ্বাসকে 'পুরাণ' আখ্যা দিয়ে রিচার্ড্‌স্‌ আমাদের অন্ধ পৌত্তলিক বলেন নি। কারণ এসব পুরাণেই আমাদের সভ্যতা। এদের অনুবর্তনেই আমাদের ইচ্ছাশক্তি সংহত, মানস তথা ইন্দ্রিয়শারীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও আমাদের বিকাশ সমঞ্জস হয়। একান্ত-সহায় এই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সর্বমানবীয় পুরাণগুলিতে অবশ্যই বিপরীত বিপদ আছে। যুক্তিবিচার যেখানে কম বিকশিত, সে অসভ্য আদিম সমাজে পুরাণ মানুষকে অনেক সময় পুরাণহীন বানরের চেয়েও ভয়ানক করে তোলে। সভ্য সমাজেও তা করে' তোলে, যার ফলে জাতিতে জাতিতে লাগে নৃশংস দ্বন্দ্ব। যদি কোন পুরাণ অন্যান্য নৈতিক সামাজিক বা আন্তর্জাতিক পুরাণের বিপক্ষে না যায়, তাহলে আমরা তাকে হয়তো বলি ধর্ম কিম্বা আদর্শ লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌। এ সব পুরাণে বিশ্বাস অল্প বিস্তর সবাই করে। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস তাকেই বলে, যে বিশ্বাস জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, আচরণকে চালিত করে। এ পূর্ণ বিশ্বাস দুর্লভ। যাদের এ আছে, তাদের কেউ ঈশ্বরের দূত বলে বা লেনিন বলে পূজা পায়, কাউকে পাঠানো হয় উন্মাদ-আশ্রমে। ভগ্নাংশ থাকলে এ বিশ্বাসের জোরে কেউ হয় ট্রট্‌স্কি, কেউ পিএর ভিদাল, কেউ শেলি, কেউ ডন্‌ জুয়ান্‌। সেই জন্যেই কোল্‌রিজের মতে অত প্রয়োজন

শুভবুদ্ধির, যে-বুদ্ধি দেয় সামঞ্জস্য। We receive but what we give, তার বেশী চাইলেই ঘটে অসাধারণত্ব—প্রতিভা বা উন্মত্ততা। এই পুরাণ সৃষ্টিতে কাব্যের স্থান ব্যাপক ও উচ্চে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পুরাণের সঙ্গে কাব্যের পুরাণের প্রধান তফাৎ হচ্ছে যে শেষোক্তের মধ্যে প্রথমের অবশ্যস্বীকার্য দাবী নেই। নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে আমরা বিপদসঙ্কুল সাগরে ও জনহীন দূর দেশে নাও যেতে পারি, কিন্তু মোটর কারের সামনে থেকে না সরলে হাঁসপাতালে যেতে হয়। যাঁরা রিচার্ডসের অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিকমন্যতায় বিরক্ত হতেন, এবারে তাঁরা খুশি হবেন। ব্র্যাডলির কথা তুলে' জ্ঞানী রিচার্ডস্ এবার বলেছেন যে কোল্‌রীজীয় ঈশ্বরের মতো বিজ্ঞানও পুরাণজীবী ও ব্যবহারী। কেন, সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য রিচার্ডসে পাওয়া যায় না পাওয়া যায় Capital পুস্তকে।

যাহোক, কোল্‌রিজের সঙ্গে সেণ্ট টমাসের মিল দেখানো এখানে অসম্ভব। তাছাড়া তফাৎই বেশি। সেণ্ট টমাসের বিপুল সর্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞান ও খর বুদ্ধির সম্পূর্ণতার অভাবের জন্যেই কোলরিজ থেকে রিচার্ডস্ তাঁর কাব্যতত্ত্ব বিকশিত করতে পারেন। তাছাড়া টমাস স্পষ্টত কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করেন নি। এমন কি মারিত্যাঁ Art and Scholasticism লেখবার আগে আমরা জানতুম না যে এ ভগবদ্বাদী দর্শনে কাব্যাদির কোনো স্থান আছে। কিন্তু ডমিনিকান্‌ব্রতী গিল্‌বি তাঁর আদিগুরুর বিপুল দর্শন থেকে কাব্যতত্ত্ব গঠন করতে পেরেছেন। ন্যায়শিক্ষিত ঘনসন্নিবদ্ধ এই সুলিখিত ছোট বইটি তাই প্রতি পৃষ্ঠায় উক্ত বৃহত্তর দর্শনের সহিত পরিচিতি ধরে নেয়। স্থানসঙ্কোচে তাঁর দার্শনিক ভাষার আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ভাষ্য করা কঠিন এবং এক জায়গায় মূলগত প্রভেদ এ কাব্যতত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রণোদিত তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র করেছে—সে হচ্ছে ঈশ্বরেই সব জ্ঞানের, সব আচরণের পূর্ণতা। তা না হলে এ তত্ত্বালোচনায় মধ্যে মধ্যে চিন্তনীয় ও গ্রাহ্য

কথা পেয়েই দ্বিধায় ক্ষান্ত হতে হত না। প্রথমত বইএর আরম্ভ ধরা যাক, জ্ঞান যে শুধু আধিপ্রত্যয়—conceptual নয় প্রত্যক্ষ ও হয়, এবং সে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মানবের পক্ষে প্রেয় ও গভীরতর জ্ঞান এই ধরে' গিলবির সূত্রপাত। কারণ শুদ্ধ প্রত্যয় নয়, অনবিচ্ছন্ন বিশেষের প্রতি মানবমনের গভীর প্রেম, এই প্রেমই ঈশ্বরের দিকে টমাস্‌কে নিয়েছিল। এরই জন্যে ঈশ্বরে বিশেষের চরম বিশেষত্ব। কাব্য এই অনবচ্ছিন্ন বিশেষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অপেক্ষাকৃত পূর্ণ পরিচয়—অপেক্ষাকৃত, কারণ মানুষের মনের গঠনে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় শুধু ঈশ্বরেরই ও ঈশ্বরেই। কোল্‌রিজের মতাবলীর সঙ্গে এ মতের সম্বন্ধ নির্ণয় স্থগিত রেখে প্রত্যক্ষানুভূতির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে একালের বৈজ্ঞানিকরাও বাগ্‌বহুল, সে কথা এখানে মনে রাখা ভালো। কোল্‌রিজ হয়তো এবং গিল্‌বি স্পষ্টই আগামী ব্যঙ্গের উত্তর দিয়ে গেছেন। টমাসের দর্শনে অপরাবুদ্ধির বা প্রত্যয়গত জ্ঞানের কারবার অবচ্ছিন্ন সার্বিক নিয়ে—সেখানে ইন্দ্রধনু দেখলে তার ব্যাস-দৈর্ঘের মাপ করতে হয় কিন্তু কবির যে বিশেষ ইন্দ্রধনু তার সত্তা ও তার জ্ঞান সেই বিশেষ ইন্দ্রধনুত্বেই। সেখানে মাপের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ টমাসের মতে form প্রত্যক্ষজ্ঞানের নয়, প্রত্যয়জ্ঞানের কারবার।

বলা দরকার যে টমাসকে বুদ্ধি-বিদ্বেষী ভাবলে ভুল হবে। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যয়বুদ্ধির তিনি পূর্বাপরমধ্য সম্বন্ধ রেখেছেন। তাই এ তত্ত্বকে thingism তথা ব্যক্তিসর্বস্ব বলে' ঝেড়ে ফেলা যায় না। টমাসের কাছে মন প্রাকৃত বিশ্বের অংশ, শরীর। এবং এই মনেরই এক প্রক্রিয়ায় কোলরিজিয়ান সুরে বিষয় ও বিষয়ী, ব্যক্তি ও বস্তু এক হয়ে ওঠে। অবশ্য এই অখণ্ডমিলন পদার্থিক নয়, চৈতন্যগত। ছবি যে দেখি, তাতে কয়েকটি রেখার যোগফল আমরা দেখি না, দেখি একটা সমগ্র ছবি। তেমনি মন দিয়ে দেখি না, বা অক্ষিতারা দিয়ে, দেখি সমস্ত ব্যক্তি দিয়ে। Gestalt মনোবিজ্ঞানের সমর্থনে গিলবি দুটো ছবি

এঁকেছেন। সে ছবি দুটিতে চারটি ক'রে রেখার মধ্যে একটিতে শুধু তফাৎ, কিন্তু সমগ্র ছবি দুটি হলো ভিন্ন। ষ্টার্লিং-কৃত উপায়ে স্নায়ু-সম্পর্কহীন করে' হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষিত হয়, কিন্তু সে হৃদয় শুধু একটি মাংস-পিণ্ড যন্ত্র। যা হোক, এই সমগ্রের সঙ্গে সমগ্রের প্রেমালাপের বাহন ইন্দ্রিয়াদি এবং এই ইন্দ্রিয়গুলির সকলের জ্ঞানরাজ্যে সমান মর্যাদা নেই। এ সব মানসিক ক্রিয়াদি কিন্তু চেতনারই কোলে। চেতনার বর্ণনা টমাস্ করেছেন। তার শুধু এক অংশ হচ্ছে স্মৃতি। চেতনার পরিচয় দিয়ে গিল্‌বি ভগবৎ-করুণার তুলনায় কাব্যজ্ঞানের পরিচর দিয়েছেন। আবে ব্রেমোঁর প্রার্থনা ও কাব্য তাকে প্রামাণ্য দিয়েছে। বইয়ের বাকি অর্ধেকের মোটামুটি এই জ্ঞানতত্ত্বের কাব্যে আরোপ। কোনো বিশেষ কবিতা তাতে আলোচিত হয় নি, পূর্বোক্ত কথাগুলি অল্পবিস্তর কাব্যার্থে বিশ্লিষ্ট, ব্যাখ্যাত, বিস্তৃত হয়েছে। তার শেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কাব্য পরমার্থজ্ঞানেরই জাতের প্রক্রিয়া, তবে বাধ্যতঃই নিচু দরের এবং একটু অসম্পূর্ণ। রিচার্ড্‌স্ অবশ্য কাব্যের পারমার্থিক গোত্র মানেন কিন্তু পরমার্থ মানেন না। মার্কসের সঙ্গে দেখছি মাথ্যু আর্ণল্ড্‌ এখনও আমাদের সমসাময়িক। রিচার্ড্‌স্ আজও একলা নয়।